KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Card No : KLMLGK 2007	Place of Publication 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection KLMLGK	Publisher আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ২৬/- ২৬/- ২৬/-	Year of Publication বৈশাখ ১৩৮৫ ॥ April-May 1978 শ্রাবণ ১৩৮৫ ॥ Aug 1978 কার্তিক ১৩৮৫ ॥ Nov 1978
	Condition Brittle Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৮৫

কলিকা... লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
১৮/এ... ...তা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মননশীল বই

- **চীন-ভারত ও ভারত-চীন পরিব্রাজকবৃন্দ**
  গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। তথ্যনিষ্ঠ সাবলীল বিবরণ। চার বিরল মানচিত্র। [১০.০০]
- **প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য**
  ডঃ নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যসমূহ সহ সংস্কৃত সাহিত্য সবিশেষ আলোচিত। [২৫.০০]
- **স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন**
  ডঃ শঙ্কর ঘোষ। তত্ত্ব ও তথ্যনিষ্ঠ অন্বেষণ। [২০.০০]
- **বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা**
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। মানচিত্র ৮ [১৫.০০]
- **সংস্কৃত নাটকের গল্প**
  অনিতা চক্রবর্তী। দশটি সংস্কৃত নাটকের কাহিনী। [৮.০০]
- **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**
  প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : অঞ্জলি বসু। প্রায় তিন হাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনচরিত। [৪০.০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

●
আজকের শিশু—
কালকের নাগরিক

●
শিশুদের যত্ন নিন।
আজই নিকটবর্তী যে কোন
হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে
যোগাযোগ করে
শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর
সুযোগ নিন।

●
পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ সংস্থার
মাস মিডিয়া ডিভিসন হইতে প্রচারিত।

●
বিজ্ঞাপন সংখ্যা— ১৬ / ৭৮-৭৯

ষষ্ঠবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা | শ্রাবণ তেরশ' পঁচাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

তুষু গানে কাব্যসৌন্দর্য ॥ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ৪৫

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য ॥ নির্মল গুপ্ত ৫০

মরাঠী কবি কেশবসুত ॥ শম্ভু মিত্র ৫৯

আলোচনা : কুমারসম্ভব—কাব্য ও কবি ॥ দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল ৬৬

সমালোচনা : ত্রিপুরার পুঁথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা ॥ পঙ্কধর ভট্টাচার্য ৭২

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিণ্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩ হইতে প্রকাশিত

সম্প্রতি প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

রাখী

রবীন্দ্রনাথের বাসনা ছিল যে তাঁর লেখা প্রেমের কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করা হোক। সেই সংকলন-গ্রন্থের জন্য তিনি 'রাখী' নামটিও নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থ লেখার পর (১৩৩৫) নানা কারণে প্রস্তাবিত সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। দীর্ঘকাল পরে কবির সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ, (১২৯৯) থেকে 'স্ফুলিঙ্গ' (১৩৫২) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল কাব্য-ভাণ্ডার থেকে নির্বাচন করে প্রেমের কবিতা সংকলন-গ্রন্থ রাখী প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ কাপড়ে বাঁধাই এবং একাধিক রঙীন চিত্রবিভূষিত এই সংকলন-গ্রন্থটি বিশেষভাবে উপহারোপযোগী। মূল্য ৩০·০০ টাকা

নটরাজ ঋতুরঙ্গমালা

'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৮৪) প্রকাশিত শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু-কর্তৃক চিত্রালংকৃত নটরাজ ঋতুরঙ্গমালা-র স্বতন্ত্র বিশেষ সংস্করণ। মূল্য ৭·৫০, শোভন ১২·০০ টাকা।

বৈকালী

প্রবাসী পত্রে প্রেরিত 'বৈকালী'র পাণ্ডুলিপি এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চাশ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) প্রচারিত অসম্পূর্ণ 'বৈকালী' একত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই গ্রন্থ 'লেখন' এর সগোত্র। গ্রন্থশেষে রচনার ইতিহাস ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংকলিত। মূল্য ১৪·০০, শোভন ১৮·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

সমকালীন

বর্ষ ২৬ শ্রাবণ ১৩৮৫

তুষু গানে কাব্যসৌন্দর্য

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

সমালোচনার অভিজাত নিয়ম পদ্ধতি মেনে তুষু গানের কলারীতি, কাব্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতে গেলে অনেকের কাছেই তা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন গ্রামবাংলার মাঠে ঘাটে বাটে গৃহে গঞ্জে যে গান স্বতই স্ফূর্ত ও উৎসারিত হচ্ছে, যে গানে স্বভাব-কবিদের রচনাও ঠিক নয়, যারা এই সব গান রচনা করেছে ও করছে, তারা নিজেদের কোনদিন কবি বলে মনে করেনি। যে গান প্রাকৃতিক নিয়মে আরণ্যক ফুল ফলের মতো অসংখ্য পরিমাণে মনের ও স্মৃতির বোঁটায় ধরে এবং ঝরে পড়ে, সেই সব গানের মাপকাঠি হিসাবে রীতিসম্মত সমালোচনার বিধান ব্যবহার করার কোন মূল্য নেই। কথাটি সত্য, কিন্তু সার্বিক সত্য নয়। ঝরে পড়া গানের কয়েক মুঠো কুড়িয়ে এনে বিচার করে দেখলে স্তম্ভিত হলেও আনন্দিত হতে হয়। রীতিসম্মত কাব্য পাঠের আনন্দের চেয়ে এ আনন্দ কোন অংশে কম নয়।

এমন কোন কথা নেই, এমন কোন ভাবভাবনা নেই, এমন কোন আনন্দ বা বেদনা নেই যা তুষুকে জানানো যায় না, গানগুলি আলাদা আলাদা ভাবে পড়ে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। সখীর সঙ্গে সখীদের প্রাণে প্রাণে যত ভালোবাসা, কানে কানে যত গুঞ্জরণ, তুষুর সঙ্গে সাধারণ নরনারীর তত ভালোবাসা, তত গুঞ্জরণ। প্রাচীন ও আধুনিক, ঐতিহাসিক সামাজিক ও পৌরাণিক, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক কত বিষয় নিয়েই না তুষুর গান রচিত হয়েছে! এই সব গানের রচয়িতা কারা? আবহমান কাল ধরে কত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এই সব গান রচনা করেছে। কিন্তু গানগুলিতে ভণিতা দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। ভণিতাহীনতাই তুষু গানের বিশিষ্ট কলারীতি।১ কোন একজন কবি বা গায়ক এখানে মাথা উঁচু করে বড় হয়ে দেখা দিতে চায় নি। যারা তুষু ব্রত

পালন করবে, যারা গানে গানে মাতাল হবে, যারা উৎসব প্রাঙ্গন ভরিয়ে তুলবে কলউচ্ছ্বাসে, তাদের মুখে গান যোগান দেবার জন্যই গান রচয়িতাদের প্রচেষ্টা, তার বেশী কিছু তারা চায় না। পূর্বে যেমন কত না গান রচিত হয়েছে, আজও তেমনি হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তেমনি রচিত হবে। তুষু গানের রাজ্যে না এলে এর সম্বন্ধে জানার অনেকখানিই বাদ পড়ে যায়। সুর-ছাড়া তুষু গানের কথাকে খাতা বোঝাই করে যাঁরা টুকেন, তাঁরা হয়তো এই সব গানের উপাদানবৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পারবেন, কিন্তু ধারণা করতে পারবেন না তার প্রাণময় বিচিত্রসুন্দর সত্তাটিকে। তুষু গানে ভণিতা নেই বলেই সে সব গান, যা কোন ব্রতচারিণী বা গায়কগায়িকার কাছে নিজস্ব গানে পরিণত হয়েছে, গানের সঙ্গে একাত্মতা লাভের মধ্যে কোন বাধা থাকে না।

একটি বা দুটি পংক্তির তুষু গান যেমন আছে, তেমনি আট দশ পংক্তির তুষু গানও আছে। কোন কোন তুষু আলোচনা ও সংকলন গ্রন্থে প্রায় সব তুষু গানকেই দু'পংক্তির দেখানো হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা নয়।২ সাধারণত তুষু গানে দেখা যায়, কোন একটি ছোট গানের সঙ্গে অন্য একটি গান যুক্ত হয়ে গেছে, কোথাও বা একটি বড় গানের মাঝখান থেকে কোন কোন পংক্তি হারিয়ে গেছে। ভাব বা অর্থ অনুযায়ী ঐ মিশ্রিত গানগুলিকে পৃথক করা উচিত বলে মনে হলেও পৃথক করা সম্ভব হয় না। তবে এই সব বিচ্যুতি অতিক্রম করলে দেখতে পাওয়া যায় তুষু গানের মধ্যেও ভাষার বিন্যাস-কৃতিত্ব, শব্দ চয়ন ও গঠনকৃতিত্ব এবং চারুত্ব আছে, কথা বলার রকমারি নিপুণতা আছে। কবিপ্রতিভার অধিকারী যাঁরা তাঁরা এগুলি রচনা করেন নি, তবু এগুলির মধ্যেও পাওয়া যাবে রূপক উপমা অলংকারের ঐশ্বর্য। ছন্দের সুনিয়মিত সংস্থাপনা গানের মধ্যে অনেক সময় দরকার হয় না। তবু কোথাও কোথাও অন্ত্যমিল সুন্দর ধ্বনি সামঞ্জস্য এনেছে। যথা—

মলিন কেন মুখশশী, ও তুষু ধন কও কথা!
কি হয়েছে মনের বেদন, বল কি মনের ব্যথা।

অথবা

এ নদী যাই ও নদী যাই কোন্ নদীতে করি স্নান,
সোনারবরণী তুষু হয়ে গেল অন্তর্ধান।

অথবা

তুই কি পারবি আমাকে?
লিরিপুরে লিরিছুঁড়ি সেউ লেরেছে আমাকে?

অথবা

তুই করিস না ফটর ফটর,
তোর দুয়ারে চালাবো মটর।

তুষু গানে ব্যবহৃত এই ধরণের অন্ত্যমিলের সহজ নিপুণতা শ্রুতিসচেতন করে তোলে। তুষু গানে ব্যবহৃত ছন্দ সাধারণতঃ চার অক্ষরে চার মাত্রার ছড়ার ছন্দ। ছড়ার ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্বের শুরুতে শ্বাসাঘাতের দোল। এই দোলটিকে আয়ত্ত করা সহজ। ব্রতচারিণী কুমারী মেয়েদের পক্ষে দুলে দুলে তালে তালে গান করায় তাই কোন জটিল বাধা থাকে না। তুষু গানে

ঐ দোলটিকে জাগিয়ে রাখতে তাই অন্ত্যমিলের চাতুরী থেকে বেশী চাতুর্য দেখা যায় মধ্যমিলে। শব্দালংকারের প্রাচুর্যও সেই কারণে ঘটেছে। কয়েকটি উদাহরণ—

* মান্‌কানালি ছোকের কুলি ছোক বিলায় কুলি কুলি।
* তুষ্ তুষলা ক্যান্ তুষলা তুষলা গো রাই।
* এ চালে খুঁই, ও চালে খুঁই, খাবো খুঁয়ের মেচুড়ী।
* বানের উপর বান চেপেছে তার উপরে ভগবান।
* আটচালা চণ্ডীমেলা বাসক ফুলের বিছানা।
* জুঁই চামেলি চাঁপার কলি বেল বেলা গেঁদা ফুল।
* কে কাঁদে কে কাঁদে কে কাঁদে দালান ধরে।
* টুসুর পায়ে সোনার নূপুর বাজছেরে অশোক বনে।

শুধু শব্দালংকার নয়, কবিতা যেখানে প্রাণ পায় সেই অর্থালংকারের সৃজনশক্তিও তুষু রচয়িতাদের মধ্যে অবারণ ভাবে আছে। আধুনিক কবিতার সঙ্গে এই সব চাতুর্যের সহযোগিতা নেই, কিন্তু নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এগুলি সত্যই মধুর। শিউলি ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে—শরৎ-প্রকৃতির এই সৌন্দর্যবৃষ্টি কোন্ কবি না বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তুষু গায়িকা যখন বলেন—'শেফালিকা পুষ্পখুশী'—তখন শিউলি গাছের খুশী, ফুলের খুশী, পুষ্পপ্রেমিকের খুশী, শরৎপ্রকৃতির খুশী এক হয়ে যেন মিশে যায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সঙ্গে কালো মেঘের তুলনা দিতে পদকর্তারা কখনও ক্লান্ত হন নি। তুষু রচয়িতারা সেই ঐতিহ্যে ওঝাকিবহাল নয়, তবু তাদের বর্ণনাতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রকাশ ভঙ্গি ধরা পড়ে 'মেঘ নয় গো কালো সোনা' উক্তির মধ্যে। ভাত যে রাঁধছে সেই সুন্দরী রূপসীর সঙ্গে চাঁদের তুলনা করলে একাধারে রূপক্ষুধা ও প্রীতিক্ষুধা মেটে, কিন্তু চাঁদের আলো কিসের-প্রতি-তুলনা? ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার থালায় চুড়ে করে সাজানো সাদা সাদা ভাতের সঙ্গে কি? রসসন্ধানী রসিক মন তুষু গানের পংক্তিতে পংক্তিতে এই ভাবে সৌন্দর্য খুঁজে ফেরার সুযোগ পায়—

* শেফালিকা পুষ্পখুশী পড়ে গো অভিরত।
* কদমতলায় মেঘ নেমেছে,
  মেঘ নয় গো কালোসোনা।
* যেন পুন্নিমা চাঁদের আলো,
  ভাত রাঁধে গো সজনী ভালো।

কবিতা হচ্ছে ছবি ও গানের অঙ্গাঙ্গী সমাহার। তুষুর সঙ্গে গানের যোগ কোন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তুষু আর গান সমানার্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য তুষু গানের সুরের মধ্যে বিভিন্ন ধরণ আছে। সুর কখনো ছড়াধর্মী, কখনো লয় তাল সহযোগে বৈঠকী গানের রীতি অনুসারী। কখনো নৃত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বচ্ছন্দে পরিবেশিত হয়।৩ কখনো সমবেত কণ্ঠের উল্লাসে ফেটে পড়তে চায় তুষু গানের আনন্দ।৪ অন্যদিকে সূক্ষ্ম স্থূল নানা ছবি রচনা করার তৎপর চাতুর্য তুষুগানের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। এটি বিস্ময়কর। এই চাতুর্যের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কবিত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীত বা উপস্থাপিত অধিকার নয়। মানুষের সহজ ভাবনাভঙ্গির

মধ্যেই আছে কবিত্ব। তুষু রচয়িতা সাধারণ নরনারী (প্রধানতঃ নারী) কত অনায়াস ভঙ্গিতে দুটি একটি রেখাতেই বাণীচিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে তার উদাহরণ—

কয়লা খাদের ময়লা বাবু সে উ করে তুষু পুজা।
আসছে বাবু ছড়ি হাতে মাঝখানে বাঁকা সিতা।
চাঁদর ঢাকা মদের বোতল ডান হাতে বাদাম ভাজা॥
ফুল চিরণী আরশি হাতে বস মা লাল চৌকিতে।
মাথাও দাও মা সীতা, লক্ষ্মী, তোমারই রাম এসেছে॥
শিবের একটি কাঁকাল চুল তাতে কাশমল্লিকের ফুল।
আচিরে পাচিরে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফোটে না।
তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই আর বসে না॥
নাড়ের শাঁখা কাঁকাল বাঁকা কলসী নিয়ে জলকে যায়।
আয়না আনতে বায়না দিলম তবু আয়না এল না,
দাঁতে মিশি, চোখে কাজল, মুখ দেখিতে পেলাম না।
আমার তিষু মুড়ি ভাজে চুঁড়ি ঝলমল করে গো।
তোমার সব দাসীগুলি তুষু পূজতে বসেছি।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘিরে তেমন ঘেরণ ঘিরেছি॥
আমার তুষু হাল ধরেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
বেছে বেছে রাখবো কামিন দাঁতে মিশি কোমর সরু॥

এই সব ছবি সযত্ন সাধনায় ফুটিয়ে তোলা হয়নি, তবু ভাষাচিত্র হিসাবে এগুলিকে উপেক্ষা করার মতো উদ্ভাসিকতা সহজে মিলবে না। কয়লাখনিতে কাজ করে সারা অঙ্গে কয়লার গুঁড়ো মেখে ময়লাবাবুর রূপটি কত চমৎকারই না ফুটে উঠেছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণের ঐ বাবুটিকে আমরা দু'শো বছর ধরে বাংলা কাব্যে উপন্যাসে নাটকে আঁকতে চেষ্টা করেছি, আঁকতে চেষ্টা করেছি 'নববাবু বিলাস'এ বা 'আলালের ঘরের দুলাল'এ বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'সধবার একাদশী'তে বা 'হুতোর প্যাঁচার নকশা'য়। কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত তুষু-রচয়িতা যেমন স্বল্প রেখায় বাবুটিকে ফুটিয়ে তুলেছে সেরকম স্বল্প আয়োজনে বোধ হয় কালিঘাটের পটুয়ারাও পারেন নি। শুধু সমাজচিত্র নয়, নরনারীর দৈহিক রূপচরিত্রও সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে তুষুগানে। শিবের এলায়িত জটায় কাশমল্লিকার (কাঠমল্লিকা ?) ফুল, লালচৌকিতে বসে সীতার মাথা বাঁধার দৃশ্য, তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম, দাঁতে মিশি ও কোমর সরু কামিন, সোনার চুড়ি ঝলমলিয়ে মুড়ি ভাজা প্রভৃতি রূপচিত্রণ কাছের মানুষকে যেমন অপরূপ করে দেখিয়েছে, তেমনি দূরবর্তী পৌরাণিক চরিত্রকেও কাছে এনেছে। তারই মধ্যে বৈধ অবৈধ রঙে মেশা একটি নারীরূপ এমনি কুশলতায় ফুটেছে যার তুলনা হয় না—'নাড়ের শাখা কাঁকাল বাঁকা কলসী নিয়ে জলকে যায়'। নাড় অর্থাৎ বিধবা অসতীর হাতে শাঁখা—এই বিপরীত কৌতুক রসের ব্যাপারটি তুষু গানে বারবার এসেছে।

উপরে উদ্ধৃত উক্তিটিতে কাব্যছন্দ ও চলমান ছবি যতখানি জীবন্ত হয়েছে, তেমন কাব্যসুন্দর

জীবন্ত ছবি সর্বত্র না পাওয়া গেলেও এগুলি যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সব চারুকলা সম্মত ও কাব্যজীবিত গানের রচয়িতা বা গায়কেরা নিজেদের 'কবি' বলে কখনই দাবী করেন না। আর এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা-কবি।

অবশ্য এই সব বাছাই করা কুশলতাই তুষু গানের শেষ পরিচয় নয়। তুষু গানে প্রৌঢ়ী কাব্যরীতির চেয়ে স্বভাবপটুত্বের উদাহরণ বেশী। তারও চেয়ে অনেক বেশী অপটু বিকাশের উদাহরণ। কথা ও আন্তরিক আবেগ এখানে অনেক সময়েই সন্ন্যস্ত হয়নি। ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলোমেলো, গুছিয়ে বলার সংযম ও সাধনা নেই। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে—একই অঞ্চলে, এমন কি একই পাড়ায় বা একই পরিবারের পরিজনদের মধ্যে। তুষু গানের কোন লিখিত রূপ নেই।৬ গান গাইবার সময় লিখিত রূপের উপর নির্ভর করা হয় না।৭ গানগুলির অধিকাংশই বহু যুগ ধরে স্মৃতি-নির্ভর বলে মুখে মুখে ভাষার ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তবু সব থেকে বড় করে চোখে পড়ে সরল মনের নিরাবরণ উচ্চারণ। হৃদয়ে, মনে ও মুখের ভাষায় প্রকাশ করার মধ্যে কোন কৃত্রিম বিভেদ নেই॥

১। অবশ্য দু'একটি গানে রচয়িতার নাম যে সংযুক্ত হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। আর এই ধরণের প্রবণতা ইদানীং কালেই দেখা দিচ্ছে।

২। ডঃ সুধীর করণের 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' (১৩৭১) নামক গ্রন্থটিতেই এই ধরণের উদাহরণ আছে 'অনুপূর্ব' অংশে।

৩। বাঁকুড়া জেলার পূর্বাঞ্চলের গ্রামে মেয়েরা কখনো সামান্য নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে তুষু গান গায়। তাছাড়া বেলিয়াতোড় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা একটি লৌকিক নৃত্য-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল তুষু গানের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে। বাঁকুড়া শহরের 'জিলা স্কুলে'র হলে ২৭শে জুন ১৯৭৬ এই অনুষ্ঠান হয়।

৪। দক্ষিণ বাঁকুড়ার পৌষকুলের যেমন ঘটে, পৌষ সংক্রান্তিতে।

৫। বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে 'মিশি' অর্থে 'নিশি' শব্দটিও প্রচলিত আছে।

৬। অবশ্য ছোট ছোট চটি বই সারা পৌষ মাস জুড়ে গ্রামে গঞ্জে বিক্রী হয়। এগুলি গ্রাম্য ছাপাখানা থেকে কিছু চলিত তুষু গান ছাপিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে কোন অর্থলোভী ও প্রচারলোভী গায়কের দ্বারা।

৭। পৌষকুলের তুষু মেলায় দেখেছি বই হাতে নিয়ে গান চলছে, কিন্তু তারা যে বইয়ের গান অনুসরণ করছে তা নয়।

দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য

নির্মল গুপ্ত

কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়ে নিমাই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' রূপে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে গেলেন পুরী। সেখান থেকে এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে তিনি ভারততীর্থ পরিক্রমায় বার হন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন—'বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন' (মধ্য। ৭ মণঃ)। গোবিন্দ কর্মকারের 'করচায়ও আছে—

'তারপরে বৈশাখের সপ্তমদিবসে,
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে'॥ (২য় সং, পৃঃ ২১)

দক্ষিণে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত কন্যাকুমারী হয়ে শ্রীচৈতন্য পশ্চিম উপকূলভাগে কেরল-কর্ণাটক-গুর্জ-মহারাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে বরদা-আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে দ্বারকা পর্যন্ত যান। সেখান থেকে ফেরার পথে নর্মদা নদীর তীর বরাবর পুব মুখো হেঁটে এসে আবার দক্ষিণমুখো হয়ে গোদাবরীর তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। এখান থেকে তিনি পুরীতে ফিরে আসেন। এই ভারত পরিক্রমায় তাঁর সময় লেগেছিল দু'বছর। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের হিসাবে '১৪৩২ এবং ১৪৩৩ শকে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ' (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, ২য় সং, ২০ পৃঃ)।

শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের পূর্বার্ধ নিয়ে প্রধানতঃ নীলাচল (পুরী) লীলা। এই পর্বার্ধেই তিনি ভাগবত প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ, বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক ও ভারত পর্যটক। এই সময়েই তিনি নাম-প্রেম ছড়াবার ভার দিলেন—বাংলাদেশে নিত্যানন্দকে, বৃন্দাবনে সনাতন ও রূপ কে। এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগ কেন্দ্র ওড়িশায় রইলেন স্বয়ং তিনি। ওড়িশায় তাঁকে ঘিরে রইলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ—যাঁদের মধ্যে ছিলেন ষড় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের পিতৃব্য, দক্ষিণভারতীয় প্রবোধানন্দ ভট্ট, ত্রিহুতের পরমানন্দ পুরী, মহারাষ্ট্রের (?) কামভট্ট, এছাড়া ওড়িশী সাহিত্যের বিখ্যাত 'পঞ্চসখা' (জগন্নাথ, বলরাম, যশোবন্ত, অচ্যুতানন্দ ও অনন্ত) এবং রায় রামানন্দ ত ছিলেনই। এই যোগাযোগের ফলে এবং বিশেষ করে ভারত ভ্রমণের ফলে শ্রীচৈতন্য তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

ওড়িশী গ্রন্থকার মাধব পট্টনায়ক, দিবাকর দাস প্রভৃতি রচিত জীবনীকাব্যে চৈতন্য জীবনের এই পর্ব যথেষ্ট প্রশংসনীয় রূপে চিত্রিত হয়েছে। পঞ্চসখা রচিত সাহিত্যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ওড়িশী জীবনে ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যবান্ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই সব রচনা অংশতঃ এখনও মেলে। চৈতন্য জীবনের ওড়িশী উপাদানগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা না হলেও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক আর্ত্তবল্লভ মহান্তি (কটক) এবং অধ্যাপক প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় (কটক) এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবের রূপরেখা নির্ণীত না

হওয়া পর্যন্ত তাঁর সমগ্র ভাবমূর্তি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে না। মনে রাখতে হবে, স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে বলেছিলেন : 'শ্রীচৈতন্যের প্রভাব রয়েছে সমগ্র ভারতে। যেখানে ভক্তিমার্গ, সেখানেই তাঁর অনুধ্যান, তাঁর মহিমা উপলব্ধির প্রয়াস'।

সেকালে তথাকথিত 'দ্বিজ'রা ছিল শূদ্রদের উপাস্য দেবতা। শূদ্ররা ছিল সমাজে উচ্চবর্ণের পদদলিত। চৈতন্য বিশ্বাস করতেন মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায়। তাঁর প্রেমভক্তিবাদে জাতিভেদের ঠাঁই ছিল না। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি,—নাই।" (বৃন্দাবন দাস : চৈতন্যভাগবত)। বর্ণাশ্রম ধর্মের নির্দেশের বিরোধিতা করে তিনি বললেন—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণ' অর্থাৎ সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীকে ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীরও উপরে স্থান দিলেন তিনি। এতে সেকালের সুবিধাবাদী পুরোহিত বা দ্বিজশ্রেণী ক্ষিপ্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবেন বলেই চৈতন্য দ্বিজত্বের চিহ্ন শিখাসূত্র ত্যাগ করেছিলেন।

"শিখাসূত্র ত্যাগ করি সন্ন্যাস লইব
তাহা না করিলে কিসে জীব উদ্ধারিব॥" (গোবিন্দ কর্মকার : করচা)

সাধারণ মানুষের প্রতি এই সম্মান ও ভালবাসা স্বভাবতই তাদের হৃদয় জয় করল। তারা এসে জড়ো হল সেই নবীন সন্ন্যাসীর কাছে, যিনি বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে, প্রথাবদ্ধ ধর্মানুষ্ঠানকে বর্জন করে, এবং পুরোহিত তন্ত্রের বিধিনিষেধকে তুচ্ছ করে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের অর্গলহীন পথে তাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : হরিনাম নিলেই মুক্তি। তাঁর প্রথার এই সরলতা সম্ভবতঃ আজকের দিনে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু সরল হলেই কোন কিছু দুর্বল হয় না। সূর্যের রশ্মি সরল, কিন্তু তাতে রয়েছে অদম্য প্রাণদা শক্তি। শ্রীচৈতন্যের দিব্যমূর্তি থেকে যে বিশ্বাস ও প্রেম বিকীর্ণ হত, তার ছোঁয়ায় তাঁর ওই সরল পন্থাটির মধ্যেই অমোঘ শক্তি সঞ্চারিত হত।

শ্রীচৈতন্য যখন ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে বার হলেন, তখন দক্ষিণভারতে এমনকি বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ভেদ প্রচণ্ডরূপে বর্তমান। T. Rajagopalachari তাঁর 'The Vaisnavite Reformers of India' গ্রন্থে লিখেছেন—(page-143)—'দক্ষিণভারতে শাস্ত্রাচার ও প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বৈষ্ণব আচার্য্যগণ মোটেই শিথিল করতে পারেনি এবং তাঁদের শূদ্র অনুগামীদের তো কোনই গুরুত্ব ছিল না। সমাজে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী কখনও জোরের সঙ্গে করতে পারেনি।' দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ সম্পর্কে রাজগোপালাচারীর মন্তব্য—'রামানুজ কখনই কঠোর শাস্ত্রবিধান থেকে এতটুকুও সরে আসেনি।' (Ramanauja in no place countenances the slightest departure from strict shastric injunction)। শূদ্র ও নারীকে রামানুজ বেদপাঠের অধিকার দেন নি। এ অধিকার মধ্বাচার্য্যও দেন নি। শ্রীচৈতন্য এই কঠোর শাস্ত্রাচারের বাইরে সহজ ভক্তিমার্গের পথ নির্দেশ করেছিলেন বলেই দক্ষিণভারতের ও পশ্চিমভারতের সাধারণ মানুষের উপর তাঁর ভ্রমণের প্রভাব হয়েছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক।

দক্ষিণভারতে জৈনধর্মের প্রভাব হ্রাসের অন্যতম কারণ শ্রীচৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তির প্লাবন। A History of Kanarise Literature গ্রন্থে E. P. Rice লিখেছেন—"মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জৈন ধর্মের প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। এর মূলে একাধিক কারণ বর্তমান। প্রথমতঃ শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব……দ্বিতীয়তঃ, Talkad-এ গঙ্গরাজ্যের পতন (১০০৪ খ্রীঃ) এবং জৈনধর্মের প্রতি বিরূপ চোলরাজাদের আধিপত্য—তৃতীয়তঃ, বল্লাল রাজার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ (আঃ ১১০০খ্রীঃ)। চতুর্থতঃ কল্যাণের বাসবাচার্য্যের নেতৃত্বে বীর শৈব ধর্মের পুনরুত্থান (আঃ ১১৬০ খ্রীঃ)। পঞ্চমতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবধর্মের বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার। ষষ্ঠতঃ, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিজয় নগরে শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। এবং সবশেষে—ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রচারিত কৃষ্ণভক্তিবাদের প্রভাবে বৈষ্ণব ভাববন্যা বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে এবং জৈনধর্মের কৃচ্ছ্রতা থেকে জনচিত্তকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে আনল"।

E. P. Rice তাঁর গ্রন্থে Popular Devotional Songs শিরোনামায় লিখেছেন—"বৈষ্ণব-দাসেরা বা ভিক্ষুক গায়কেরা ত্রিপদী ছন্দে গান রচনা করে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন গ্রামে গ্রামে। এঁরাই কৃষ্ণ উপাসনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন মধ্বাচার্য্য ও চৈতন্য। চৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ভারতের সব বিখ্যাত মন্দির দর্শন করেছিলেন। সর্বত্র মানুষকে শিখিয়েছিলেন হরিনাম নিতে।"

এই একই কথা লিখেছেন ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী—popular songs in 'ragale' metre by 'dasas' (mendicant singers) was another from of Vishnava literature in Kannada in this period. These singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaray. and the visit of chaitanya to the south in 1510 did much to stimulate the growth of this popular type of song"—A History of south India—page 393.

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে দক্ষিণ-ভারতের মানুষ সচেতন। মহীশূর কুর্গ অঞ্চলের 'সাতানি' (চৈতন্য সাতানি ?) সম্প্রদায়ের লোকেরা এ শতাব্দীর গোড়াতেই বলেছেন, তাঁরা চৈতন্যের অনুগামী এবং বাংলা দেশের বৈষ্ণব।

Imperial Gazetteer of India—'Mysore and Coorg' (1908) গ্রন্থে জানান হয়েছে—"The 'satani' are the neaxt most numerous religious sect. They are regarded as priests by the Holeya and other inferior casts…They are Votories of Vishnu, especially in the form of Krisnna, and are fllowers of Chaitanya, As a rule they are engaged in the service of Vaishnava temples, and are flower-gatherers, torch-bearers, and strolling musicians. They call themselves Vaishnavas, the Baishnabs of Bengal"—page-48.

১৫১০-১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষত : অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে শাস্ত্রযুদ্ধ করতে আসতেন। সেকালের রীতিই ছিল তাই। শ্রীচৈতন্য সাধারণতঃ

দার্শনিক বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। যাঁরা আসতেন তর্কস্পৃহা নিয়ে, তারা কখনও তাঁর দু'একটি কথায়, কখনও তাঁর অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের দিব্যস্পর্শে বিজিত হয়ে ফিরে যেতেন। পরমতত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের সামান্যতম আভাষেই শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এমন এক দিব্য উন্মাদনার স্ফুরণ হত যে, তার সামনে পণ্ডিতদের পণ্ডিতাভিমান লজ্জা পেত। বিদ্যাগর্বের মুল উপড়ে ফেলে মহাপ্রভু তাঁদের হৃদয়ে উপলব্ধির বীজ বপন করতেন। পণ্ডিতাভিমানী পরিণত হত দিব্যপ্রেমের দীন ভিক্ষুকে।

এই সব পণ্ডিতদের কয়েক জনের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে গোবিন্দ কর্মকারের 'করচায়'। এঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে এখনও ব্যক্তিপরিচয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব। কেননা এঁদের রচনা নিদর্শন এখনও কিছু কিছু পাওয়া যায়। গোবিন্দ কর্মকারের করচা-গ্রন্থটির প্রামাণিকতার এ একটা বড় প্রমাণও বটে।

'গোবিন্দ কর্মকারের করচা' অনুসারে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ঢুণ্ডিরাম তীর্থের দেখা হয়েছিল তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে। করচায় আছে—

"প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী। তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলে বেদান্ত দর্শন। সর্বশাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মুরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি। বারবার তোমার নিকটে হারি মানি॥
ইতি উতি চেয়ে ঢুণ্ডি প্রভুর চরণে। লোটাইয়া পড়িলেন অতি শুদ্ধ মনে॥
ঢুণ্ডিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয়। কাণাকাণি পাষণ্ডেরা কত কথা হয়॥

(কড়চা ২য় সং, ২৩—২৪ পৃঃ)

এই 'ঢুণ্ডিরাম'ই কি কৃষ্ণদেব রায়ের সভাসদ 'হরিদাস'? ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন—"হরিদাস ছিলেন বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভাসদ এক বৈষ্ণব কবি। তিনি 'ইরুসময়-বিলকম্' নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন। এতে তিনি শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর পক্ষপাত এতে সুস্পষ্ট।" [A History of South India, page-374]

রূপ গোস্বামী সংকলিত 'পদ্যাবলী'র একটি শ্লোকের (১০২ সংখ্যক) রচয়িতাও এক হরিদাস। শ্লোকটিতে কবি হরিদাস বলেছেন—'স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই, শ্রীসম্পদেই বা কি হবে? জীবচক্র থেকে নিবৃত্তিও আমি চাই না। আমার মন হারিয়ে গেছে যমুনা পুলিনের নিকুঞ্জে নবতমালের নীল জ্যোতির মধ্যে'।

'অলং ত্রিদিববার্তায়া কিমিতি সার্বভৌমশ্রিয়া
বিদূরবর্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি।
কলিন্দ-গিরিনন্দিনী-তট-নিকুঞ্জ-পুঞ্জোদরে
মনো হরতি কেবলং নবতমাল নীলং মহঃ।

এই হরিদাস, বিজয় নগরের হরিদাস এবং গোবিন্দ কর্মকার-উল্লেখিত হরিদাস (ঢুণ্ডিরাম) একই ব্যক্তি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

গোবিন্দ কর্মকার এরপর বেঙ্কটনগরের রামানন্দ স্বামীর কথা বলেছেন।

"তারপর প্রভু মোর বেঙ্কটনগরে। উপনীত হৈল গিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে॥
সেইখানে ছিল এক পণ্ডিত গোঁসাই। বেদান্তে পণ্ডিত বড় তুল্য তার নাই॥
বিচার করিতে চাহে পণ্ডিত প্রবর। হারিলাম বলি প্রভু করয়ে উত্তর॥
তথাপি না ছাড়ে স্বামী বিচার করিতে। বদন বিকাসি প্রভু লাগিলা হাসিতে॥
অদ্বৈতবাদের কথা স্বামী যত কয়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ তুলি চৈতন্য বুঝায়॥
অবশেষে ঘোরতর বিচার বাঁধিল। ক্রমে ক্রমে দণ্ডিস্বামী হারি মানি নিল॥
রামানন্দ নাম তার বড়ই পণ্ডিত। হরিনামে রামানন্দ হইলা দীক্ষিত॥
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া। পড়িল স্বামীর মনে ভক্তি উছলিয়া॥ (করচা-২৮ পৃঃ)

এই রামানন্দ স্বামী সম্ভবতঃ রামানন্দ তীর্থ স্বামী। হরিদাস দাস সঙ্কলিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' গ্রন্থে (১৬৬০ পৃঃ) 'রামানন্দ তীর্থ স্বামী' সম্পর্কে বলা হয়েছে—ইনি 'প্রেমভক্তি স্তোত্র' রচয়িতা—গদ্যে পদ্যে রচিত এই সংস্কৃত গ্রন্থে ৯৪টি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে—"হৃষ্টচিত্তে সুন্দরী গঙ্গা যাঁর পাদপদ্মে শতদল অর্পণ করেন, সেই প্রেমবীজ বালার্ক-সদৃশ-কান্তি শ্রীচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।'

'হৃষ্টা গঙ্গোত্তমাঙ্গা ক্ষিপতি শতদলং যস্য পাদারবিন্দম্।
তং চৈতন্যাখ্যরূপং তরুনবররুচিং প্রেমবীজং ভজেহহম্॥'

এছাড়া গোবিন্দ কর্মকারের করচায় এক 'ভট্ট ব্রাহ্মণের' কথাও বলা হয়েছে। তাঞ্জোরের সন্নিকটে শ্রীচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন।—

"সেইখানে ভট্টনামে এক বিপ্রবর। প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর॥
কৃষ্ণনাম শুনি বিপ্র পাগল হইল। দয়াল চৈতন্য কৃপা তাহারে করিল॥
হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয়। লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয়॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে। তাহা হেরি ব্রাহ্মণের পুলক অন্তরে॥"

(করচা ৩৫পৃঃ)

এই 'ভট্ট' ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ 'প্রবোধানন্দ ভট্ট (সরস্বতী'—বিখ্যাত গোস্বামী গোপাল ভট্টের পিতৃব্য এবং গুরু। প্রবোধানন্দ সংস্কৃত ভাষায় 'চৈতন্য চন্দ্রামৃত' নামে স্তোত্রবাক্য রচনা করেছিলেন। এতে বারোটি বিভাগে মোট ১৪৩টি শ্লোক আছে।

প্রবোধানন্দ লিখেছেন—"তীব্রবীর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ আমার লৌকিক আচার নিষ্ঠা বৈদিক ব্যবহার উচ্চ কীর্ত্তন, প্রহসন ও নাট্যোৎসবে আমার লজ্জা, আমার সব হরণ করে নিয়েছেন—'গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোহপি মে তীব্রবীর্য্যঃ। (চৈতন্য চন্দ্রামৃত, ৬০)।

১০৫ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন, দূর থেকে মহাপ্রভুকে দেখলেই তাঁর দিব্যপ্রভাবে বিচার মল্লদের হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে যেত।—"দূরাদেব দহন্ কুতর্কশলভান্ কোটীন্দুসংশীতলো"—কোটীচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ তাঁর আবির্ভাব—দূর থেকেই কুতর্করূপ পতঙ্গদের দগ্ধ করত।

ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর 'Studies in Bengal Vaishnavism' গ্রন্থে লিখেছেন—'এ গ্রন্থটি (চৈতন্য চন্দ্রামৃত) বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে তেমন প্রচারিত না হলেও এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

……চৈতন্যের যুগল অবতার সম্পর্কে গ্রন্থকার সচেতন। ১৩ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন যে চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলতত্ত্ব পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্মের সৌন্দর্য্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। (১৩৮ পৃঃ)

প্রবোধানন্দ নামগান রত গৌরহরিকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য-গর্ব প্রকাশ করে লিখেছেন—"যাঁরা গৌরকে একবারও চোখে দেখেননি, ভক্তি তাঁদের দুর্ঘট।"—গৌরো দৃষ্টঃ সকৃদপি ন যৈঃ দুর্ঘটা তেষু ভক্তিঃ (শ্লোক-৩৮)

১১৪ সংখ্যক শ্লোকে তিনি লিখেছেন—"গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে প্রতিটি গৃহ হরিসংকীর্ত্তনের ধ্বনিতে পরিপূরিত"—'অভূদ্ গেহে গেহে হরি সংকীর্ত্তনরবো।'

দক্ষিণভারতে বৈরাগী 'দাস' গায়কেরা তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালায়লম্ ভাষায় বৈষ্ণব গীত রচনা করেছিলেন। রেভারেণ্ড ডঃ মোগলিং (Moegling) কানাড়ী ভাষায় এ ধরণের ৪০২টি ধর্মীয় গীত সংগ্রহ করেন। ১৮৫৩ সালে এর ১৭৪টি গীত "দাসর পদগলু" নামে ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত হয়।

"Folk Songs of Southern India" (১৮৭১ খ্রীঃ) গ্রন্থে Charles E. Gover এই ধরণের ২৮টি গীতের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—বিয়েবাড়ী, ভোজবাড়ী, ব্রত উপবাস—শ্রাদ্ধ-শান্তি, বীজবপন, ফসলকাটা, পূর্ণিমাসংক্রান্ত—প্রতিটি উপলক্ষে 'দাস' গায়ককে ডেকে গান শোনা এবং তাকে ভেট দেওয়া ছিল অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।……দাসদের আচরণীয়—প্রথমতঃ দারিদ্র্য (আকাশবৃত্তি), দ্বিতীয়তঃ ভজন, তৃতীয়তঃ জাতিভেদ বিস্মরণ।… দাসদের ক্ষেত্রে জাতের প্রশ্ন মোটেই উঠত না। হরিদাসদের ঘৃণা করার সাহস কারো ছিল না। (No question Caste entered into the matter……None dared to despise the 'slave of God' Introduction.)

গোভার অনূদিত ৪নং কবিতাটি এই জাতীয় রচনার একটি চমৎকার নিদর্শন—

If we look through all the earth,	যখন তাকাই সারা পৃথিবীর দিকে,
Men, we see, have equal birth,	জন্মসূত্রে সমান ত দেখি যত নর ও নারীকে।
Made in one great brother-hood,	সহোদর শিশুদের পানে চেয়ে র'ন বিশ্বমাতা
Equal in the sight of God.	সমান প্রসন্ন দৃষ্টি ; অন্তর্যামী আছেন বিধাতা।
Food or Caste or place of birth,	খাদ্য-জাতি-জন্মস্থান
Cannot alter human worth,	মানুষের মূল্যটুকু করিতে পারেনা কভু ম্লান।
why let caste be so supreme ?	তবে কেন জাতি-অভিমান ?

[লেখক কৃত অনুবাদ]

এই গীতটি তেলুগু ভাষায় রচিত। রচয়িতা কবি 'বেমন'। গোভার ভূমিকায় জানিয়েছেন—"বর্তমান কালের তেলুগু গবেষকদের অগ্রণী Mr. C. P, Brown এর মতে 'বেমন' ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।' সেক্ষেত্রে বেমন সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই এ পদ রচনা করেছিলেন।

E. P. Rice লিখেছেন, "কানাড়ী সাহিত্যের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগের ধর্মচিন্তা প্রভাবিত

বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।……বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের অভ্যুত্থান হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্যের সময়। সেই ধারা মধ্বাচার্য্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চৈতন্যের সময় পুনরুজ্জীবিত হয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল।

(A History of kanarese Literature, page-12-13)।

ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী এই অধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন—"কানাড়ী সাহিত্যে এই প্রথম ষট্‌পদী ও ত্রিপদী এবং ধ্রুবপদ বা ধুয়াপদ যুক্ত গীতিকবিতার আবির্ভাব হল। (This period forms a definite transition marked by some notable changes……new metres distinctive of kannada like shatpadi and Tripadi, verses with six and three lines respectively, and ragales, lyrical poems with refrains, came into vague' —A History of south India, page-389)

গোভার অনুদিত নবম পদটি কানাড়া ভাষায় রচিত একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এর শিরোনামা 'আমি কেন হাসি' (why I laugh), এর কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল—

I. One night I saw a man	একদিন রাতে আমি দেখিলাম তারে
Kissing a harlots lips,	চুম্বিতেছে হর্ষভরে বারাঙ্গনারে ;
Next morn to bathe he ran	পরদিন প্রাতে দেখি পূর্ণস্নান তরে
And prayed on fingers-tips !	ধাবমান সেইজন জপমালা করে।
Chorus :-Oh, how I laugh ! I laugh out loud.	হো-হো-হাসি পাচ্ছে বেজায়
It makes me laugh to see the Crowd,	কাণ্ড দেখে দম রাখা দায়
Such tricks, they do. I oft have vowed	ভাবছি যত হাসব না আর
I'd laugh no more : with it I'm bowed	দম্‌কা হাসি পেটটা নাচায়॥ ধ্রু॥
2. A woman left her house	এক নারী ঘর ছাড়ে রাতের আঁধারে
And joined a man as mean,	শুটি শুটি চলে উপপতির আগারে।
She made a thousand vows	প্রাতে তিনি করেন গো হাজারটা ব্রত,
And washed at holy stream !	পবিত্র গঙ্গায় নিত্য পুণ্যস্নান-রত !
Chorus:—Oh, how I laugh ! & C,	হো-হো-হাসি পাচ্ছে বেজায়…॥ ধ্রু॥

গোভার অনূদিত ষোড়শ পদটি বিদ্যাপতির 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' পদটিকে মনে করিয়ে দেয়। পদটির প্রথমাংশ উদ্ধৃত হল—

1, A weary and broken man	ক্লান্ত পথিক আমি ভগ্ন তনুমন
with sorrow I come to thy feet	তোমার চরণতলে লইনু শরণ।
Subdued by the fate and the ban	অদৃষ্টের চক্রপিষ্ট, নয়ন আঁধার…
That hides the long future I meet…	ভবিষ্যৎ অন্ধ। হায়, সমুখে আঁধার

2, I counted as dearest on earth	ভেবেছিনু আর কিছু নাই এ ধরায়।
Fair women, great wealth and wide land :	সুন্দরী রমণী বশে কাটাব বিষয় রসে জীবন বৃথায়
And saw not the joy and the worth	তোমার আশীষ পূত আনন্দ অদ্ভুত
of merited grace from they hand	না পাইনু হায়॥

[লেখক কৃত অনুবাদ]

গোভার অনূদিত একটি মালয়ালম গানে দেখা যায়, কৃষ্ণের কপটতায় রাধা মান করে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করে বসে আছেন, কৃষ্ণ নানারকমভাবে নিজের নিরপরাধের কথা বলে দ্বার উন্মুক্ত করার অনুরোধ করছেন। গানটির আংশিক উদ্ধৃত হল—

Radha

How many lies a God can tell !
I will not 'ope the door, for I
Can smell perfumes, can see the ash
Telling of thy sin.

Krishna

I tell you but the truth, yet you
Think me a liar. I am pained
That you should doubt me, Open then ;
Let me enter now !

রাধা ঃ ভাবছি বসে দেবতা কতই মিথ্যা কয়।
দরজা আমি খুলছি নাকো। ভাগ্য জানি মন্দ।
পাচ্ছি তোমার অঙ্গবাসে অন্য নারীর গন্ধ—
পাপ কি চাপা রয় ?

কৃষ্ণ ঃ সত্যি কথাই কইছি তোমায়, তবুও তুমি হায়
ভাবছ আমায় মিথ্যাবাদী ; হায় নিঠুরা প্রিয়া
তোমার বৃথা সন্দেহটা ঘোচাই যে কী দিয়া,
কী করি উপায় ?

[লেখক কৃত অনুবাদ]

গোভার তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানিয়েছেন যে, এই ধরণের গান "আজও মালাবার উপকূলে লোকের মুখে মুখে শোনা যায় এবং এ কারণে এ গুলি নিঃসন্দেহে লোকগীতি। তবে এদের ভাষা এমন পুরানো যে মনে হয় এগুলি অতীতের এক অপস্রিয়মান কাব্যধারার ভগ্নাবশেষ —নিঃসন্দেহে এক শতাব্দীর আগে এগুলি আজকের তুলনায় অনেক বেশী পরিচিত ছিল। এই প্রাচীনতা সত্ত্বেও এগুলি মূলতঃ দ্রাবিড় রচনা নয়। এগুলি স্পষ্টতঃ পৌরাণিক……সম্পূর্ণ ভাগবততিত্তিক।….এগুলি কোন বহিরাগত বিষয়ের ভাষান্তরিত ও লোক প্রচলিত রূপ…

(They are antique in language, probably the remnants of a fading class of poetry, and are evidently less known now than they were a century ago. Not withstanding their age, they are not Dravidian, for, as will be seen, they are purely puranic and are based altogether on the Bhagavatam···They are popular adaptions of a foreign theme."—page 241)।

আমরা অনুমান করিতে পারি দ্রাবিড় দেশে এই কাব্যধারা কোথা থেকে এসেছিল ; কেননা শ্রীচৈতন্য যেখানেই গেছেন সেখানেই ভাগবত পাঠে উৎসাহ দিয়েছেন। ধ্রুবপদযুক্ত গীতি কবিতার ধারাটি স্পষ্টতঃ বাংলা পদাবলীর অনুকরণ। যেহেতু দ্রাবিড় সাহিত্যে এ ধারাটি ষোড়শ শতাব্দীর সংযোজন, সুতরাং এক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কেননা চৈতন্য শুধু বৈষ্ণব ধর্মই প্রচার করেন নি, প্রচার করেছেন বৈষ্ণব সাহিত্যও—জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি।' এই রচনাগুলি সবই ধ্রুবপদযুক্ত গীতিকবিতা।

এই ধরণের পদাবলী সঙ্কীর্তনের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য কতকগুলি বিশিষ্ট প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। কবি কর্ণপুরের নাটকে সার্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে বলেছেন, "এই সঙ্কীর্তন ভগবান চৈতন্যের সৃষ্টি"—ইয়ং ভগবচ্চৈতন্য সৃষ্টিঃ ('চৈতন্য চন্দ্রোদয়', অষ্টম অঙ্ক)। দ্রাবিড় দেশের 'দাস' গায়কেরা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন, কীর্তন রীতির দিক থেকেও তেমনই, শ্রীচৈতন্য কর্তৃক সম্ভবতঃ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব না হলেও, এই লোকপ্রিয় গীতরচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যটিকে ভিত্তি করে যে সব তথ্য এখানে সংগৃহীত ও আলোচিত হল, তাতে নিঃসংশয়ে বলা যায়—শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যে আজও তার সাক্ষ্য বর্তমান।

মরাঠী কবি কেশবসুত

শম্ভু মিত্র

আধুনিক মরাঠী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা কেশবসুত (আসল নাম কৃষ্ণাজী কেশব দামলে) ১৮৬৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কেশব বিঠবল দামলে ছিলেন শিক্ষক, মা ছিলেন জমিদার-নন্দিনী। পাঁচ ভাই ও ছয় বোনের ভেতর কেশবসুত ছিলেন চতুর্থ। মেজো শ্রীধর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হন। ইনি বরোদায় অধ্যাপনা করতেন। শ্রীধরের অকালমৃত্যু হওয়ায় কেশবসুত মামার কাছে ওয়ার্ধায় চলে যান। সেখানে ইংরেজি শেখার উপযুক্ত সুযোগ না থাকায় তিনি নাগপুরে আসেন। এখানে কবি নারায়ণ বামন টিলকের সংস্পর্শে এসে কবিতা রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। এই সময় সমাজ সংস্কারক বাসুদেব বলবন্ত পটবর্ধনের সংগে ঘনিষ্ঠতা হয়। কাব্যের আদর্শ বিষয়ে পটবর্ধনের মতবাদ কবির ওপর নাকি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিছুদিনের জন্য পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। এরপর পুনায় আসেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। পুনায় থাকার সময় প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপটে এবং কবি অনুবাদক গোবিন্দ বাসুদেব কানিটকরের সংগেও ঘনিষ্ঠতা হয়। স্বভাবে কেশবসুত ছিলেন লাজুক ও নির্জনতাপ্রিয়, তাই জাতীয় বা সামাজিক আন্দোলন তখনও তাঁর কাব্যভাবনাকে তেমন করে ছুঁতে পারে নি। সত্যি বলতে কি, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই বিয়োগান্ত ও বেদনার্ত। এই আত্মকেন্দ্রিকতার মূলে ছিল পরিবারস্থ অধিকাংশ সদস্যের অপমৃত্যুর লাভ। সে যাই হোক, ডিগ্রি না থাকায় চাকরি পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল কবিকে। স্কুলের জীবিকায় স্বচ্ছলতা আসে নি, তাই ট্যুইশনও করেছেন। আত্মসম্মানবোধ তীক্ষ্ণ থাকায় চাকরির জন্য কারো কাছে হাত পাতেন নি। কখনও বেকার হয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। শেষজীবনে খান্দেশে বেশকিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। এখানে স্বদেশী কবি বিনায়ক জনার্দন করন্দীকরের সংগে সাক্ষাৎকার ঘটে। এখানেই কবি তাঁর কাংখিত প্রাকৃতিক পরিবেশ খুঁজে পান। এখানে পড়াশুনার পর্যাপ্ত অবকাশ থাকায় কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে তাঁর নানা ধ্যানধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় —কাব্যে ঘটে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুপ্রবেশ। স্পষ্টবাদী ছিলেন বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সংগে বনিবনা না হওয়ার ফলে তিনি ধারওয়াড়ে চলে আসেন। ধারওয়াড়ে সম্ভবত তার মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পায়—জীবনের অসারতা ও অনিবার্য পরিণতি নিয়ে কবি চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিছুদিন পর অসুস্থ কাকাকে দেখতে হুবলি যান। সে সময়ে হুবলিতে প্লেগ মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এই অসামান্য প্রতিভাধর কবির জীবনের আকস্মিক করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

কেশবসুতের কবিতাকে মুখ্যতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা চলে : প্রকৃতি বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক, দেশাত্মবোধক তথা সমাজসমস্যা বিষয়ক এবং অনুবাদ। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় তাঁর বিষাদগ্রস্ত মানসিকতা কারোরই নজর এড়াবে না। মনের তৃষ্ণা, ভাবনার বেদনা বিসর্জন দিয়ে তিনি খুঁজেছেন একমুঠো শান্তি। বাক্যমনের অতীত কি এক অজ্ঞাতলোকেই যেন তাঁর অভিষ্ট। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ

কবিতা ‘ঝপুঝ’ায়’ কবির সৃষ্টিমুখর মন পৃথিবী গ্রহ তারা ছাড়িয়ে কোনো এক বিশালতর বিশ্বে, বিচিত্র অনুভূতির জগতে বিহার করতে চেয়েছে। কবিতাটি অনুধাবন করলে মনে হবে কবি তাঁর অভিষ্টকে পেয়ে গেছেন, কিন্তু না। হরপালে’ শ্রেয় (হারানো অতীত) পড়লে মনে হবে দুঃখই কবির নিত্যসংগী। এই কবিতায় দেখা যাবে কবি যেন অজানা অচেনা দেশে পথ হারিয়েছেন, আশ্রয়ের জন্য তিনি উন্মত্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। এক ঘেড়ে’ (একটি গ্রাম—কবিতাটিতে গোল্ডস্মিথের দ্য ডেজার্টেড ভিলেজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের দ্য প্রেলিউড-এর ছায়া পড়েছে) এবং নৈঋত্যেকডীল ওয়ারা (নৈঋত কোণের বাতাস) কবিতায় কবির প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার ব্যাকুল আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। পর্জন্যাপ্রত (বর্ষার প্রতি) কালিদাসের ঋতুসংহারের কথা স্মরণ করায়। ‘দীওয়ালী’ কবিতায় প্রাচীন সংস্কৃত কবিসুলভ শরৎ বর্ণনা সত্যই মনোহর। এই কবিতাতেও প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরে পেতে চেয়েছেন কেশবসুত। তাঁর অন্তর্লীন বিষাদ এখানেও সংগ ছাড়ে নি। বিষণ্ণতা পরিহারের উদ্দেশে তাই তিনি আলো ঝলমল দেয়ালিতে শহরের কোলাহলের বাইরে গিরনা নদীর ধারে সময় কাটাতে ব্যাকুল হয়ে কোথাও কোথাও ফুল (পুষ্পাপ্রত), প্রজাপতি (ফুল পাংথরু) ভ্রমর (ভৃংগ) ইত্যাদির জীবনচর্যায় রোমাঞ্চিত শিহরিত হয়েছেন, জীবন তথা আনন্দের বৃহত্তর অর্থ সন্ধান করেছেন। কিন্তু এসব প্রসংগ এসেছে, মানসিক দুরবস্থার এ্যান্টিথিসিস হিসেবেই। ভৃংগ কবিতায় কবি বলেছেন : ‘অনেক দেখে এবং শুনে সার বুঝেছি আজ / এই পৃথিবী দুঃখ ছাড়া আর কিছুই তো নয়, / সুন্দর যাওবা আছে, সবি ভরা কাঁটায়। / তোমার ঐ রসের ধারা কে পেয়েছে কবে ? / তোমার মত তন্ময়তা পাব নাকি আমি ? / ইচ্ছা করে তোমার মত মধুলোভী হই / লতায় লতায় ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে বসি’। মনে হয় এমার্সনের প্রকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ কবির প্রাকৃতিক প্রশান্ত পরিবেশে ফিরে যাবার রসদ জুগিয়েছে। জীবনের যে সুর হারিয়ে গেছে তা খুঁজতে কবি যেতে চান বনে (‘সুদূরে নিঃসংগ যাত্রী’ কবিতা দ্রষ্টব্য) একতারাটি হাতে নিয়ে। কেশবসুতের প্রকৃতিপ্রেমের সংগে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিভাবনার কিছু মিল আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি একাধারে শিক্ষক প্রেরণাদাতা এবং ভয় ত্রাসের উৎস। কেশবসুতের প্রকৃতি অবশ্যই শিক্ষক প্রেরণাদাতা এবং আনন্দের উৎসস্থল কিন্তু কখনই ভীতি উদ্রেক করে না। কেশবসুতের ‘ঘূর্নি হাওয়া’ ওয়ার্ডসওয়ার্থের হাতে পড়লে ভীতিসঞ্চারী রূপ নিতে পারত কিন্তু কেশবসুতের হাতে এই হাওয়া পরমানন্দময় চেতনায় মিলে যাবার দার্শনিক প্রতীক। এমনকি শেষ বয়সে লেখা হরপালে’ শ্রেয় (কবিতাটির সংগে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ওড টু ইনটিমেশনস অব ইম্‌মর্টালিটির ভাবগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়) কবিতায় প্রকৃতির এই আনন্দদায়ী পথনির্দেশকের ভূমিকা দেখা না গেলেও তা কখনই ভয় সঞ্চারের উৎস হয় নি। আগেই বলেছি বিষণ্ণতার ছোঁয়া কবিতাটিকে বেদনাবিধুর করে তুলেছে। যে কবি যৌবনে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তিনিই শেষজীবনে ঈশ্বরবাদী হয়ে তাকে খুঁজছেন বনে বা নদীর ধারে। ‘হাপুস নয়নে কাঁদি নদীতীরে বনে / পেয়েও পাইনি আমি আরাধ্য রতনে। / প্রদীপের কাছে প্রিয় পতংগ / আহুতিতে পায় প্রেমেরি সংগ ; / যবে ফিরে পাব আপনারে আমি / প্রাণ সঁপে দেব ওই পায়ে স্বামি !

মরাঠী ভাষায় প্রকৃত প্রেমের কবিতা রচনার সূত্রপাত করেন কেশবসুতই। বহিরঙ্গে ইংরাজী প্রেমকবিতার সংগে সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর কবিতার অন্তরংগ যোগ ছিল কালিদাস

ভবভূতির সংগেই। কেশবসুতের আগে মরাঠী কাব্যে যুবকযুবতীর প্রকৃতিসিদ্ধ প্রেম, পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ মিলন-বিরহকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। তাঁর কবিতায় প্রেমের বিমূর্ত ও দেহাতীত ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। কবি প্রেমকে হারের মত গলায় পরতে চান। প্রেয়সী রুষ্ট হলে ‘বাঁচিবার সাধ হায় ঘোচে যে পলকে।’ মাঝা অন্ত (আমার মৃত্যু) অবশ্যই প্রিয়ার সংগকামী প্রেমিকের ভাবনাবাহী কবিতা। কিন্তু এক বুক উদ্দাম যৌবনের গহন গাহনের অপরিমেয় তৃপ্তিজাত কবিতার অসামান্য সাধারণীকরণ তথা অলৌকিক ভাবের বিমূর্ত লৌকিক প্রকাশের মর্মস্পর্শী নিদর্শন এই কবিতাটি। এতে অলৌকিক কবি-প্রতিভার লৌকিক রূপান্তর সত্যই মনোগ্রাহী হয়েছে। অন্য কথায় বলা চলে, সামান্য বিষয়ের মধ্যেই অসামান্যর সন্ধান করেছেন কবি : ‘দেখিয়াছি আহা কিবা রূপসীকে তন্বী / জীবনের সেই স্মৃতি কি ভাষায় বর্ণি ? / বজ্রাহত বৃক্ষ কিছু বলিতে কি পারে ? / আমারো তেমনি দশা কথা নাহি সরে।’ ক্ষণিকোদিব্যদর্শন, সৃষ্টি, তত্ত্ব এবং দিব্যদৃষ্টি, শব্দ তুমি ফিরে এস, কবি এবং কবিতা ইত্যাদি রচনায় কবি বলতে চেয়েছেন কবিতা স্বর্গীয় বস্তু ছাড়া আর কিছু নয়। উপরিউক্ত কবিতাগুলি নারী প্রেমের কবিতা না হলেও অলৌকিক শক্তিদাত্রী স্বর্গীয় কবি প্রতিভারূপী প্রেমচ্ছটার নির্ভুল পরিচয়বাহী। কবি ভ্রমরের গানকেও ‘সৃষ্টিচে গমতে কবন’ (সৃষ্টিরূপী মহিলা কবির কাব্য) বলেছেন। বোদলেয়ারের মত কেশবসুতও স্বপ্নলোকে বিহার করলেও কবি অজানা অদেখাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হন না তাই কীটসের তীব্র অনুভববেদ্যতাও তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় না। তাঁর নারীপ্রেম গোবিন্দ দাসের মত “ভালবাসি আমি তারে অস্থি মাংস সহ”—এ কথাও বলেন না। তাঁর প্রেমে চুম্বনের উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকলেও আলিংগন বা দৈহিক আকর্ষণের বর্ণনা নেই (প্রীতি ইত্যাদি কবিতায় চুম্বন আলিংগনের কথা থাকলেও তা নেহাৎই ব্যতিক্রম বলতে হবে) বললেই চলে। তাঁর চুম্বন, আলিংগন প্রকৃতি-প্রেমেরই অংগ—‘পুষ্পাপ্রত’, ‘ভৃংগ’ ইত্যাদি কবিতাই তার প্রমাণ। এ যেন ‘রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।’ কামলিপ্সাজাত আদিরসাত্মক লাবণী লোককাব্যের প্রাধান্যের যুগে কেশবসুতের বিমূর্ত কামগন্ধহীন প্রেম একটা যুগান্তকারী ঘটনাই বটে। প্রেম হল দেবতার দান। ‘প্রেম তো মেলে না মাঠে ঘাটে / পাড়ায় পাড়ায় বাটে হাটে। / নন্দনবনে কল্পলতায় / বসন্ত এলো দিব্য শোভায়। / সেই লতারই বীজ বুনেছি মনের বনের মাটিতে / সেই তো ক্রমে রূপ নিল যে প্রীতিতে। / …প্রীতির মালা পরাই প্রিয়র গলে / ফিরিয়ে দেয় সে দ্বিগুণ ফুলে ফলে।’ প্রেয়সী সংগে থাকলে অরণ্যও কবির কাছে পুষ্পোদ্যান বলে মনে হয়। একটি সনেটে (মরাঠীতে সুনীত) কবি শাজাহানের দুই কীর্তি ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহলের মধ্যে তুলনা করে তাজমহলের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁর মতে ময়ূর সিংহাসন হল ঐশ্বর্যের স্থূল প্রকাশ তাই সে লুণ্ঠিত হয়েছে কিন্তু তাজমহল কালের প্রহরীকে এড়িয়ে প্রেমের চিরন্তন প্রতীকরূপে এখনো অম্লান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেম প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর ভাষায় কোন সংকোচ ছিল না—নারীর সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা খোলাখুলি ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন কিন্তু সে অভিব্যক্তি কোথাও শ্লীলতার মাত্রা ছাড়ায় নি। তাঁর পূর্বে এই প্রকাশ ছিল অশ্লীল—কেশবসুত অশ্লীলতা এবং অযথা অলংকার বাহুল্যকে সযত্নে এড়িয়ে প্রমাণ করলেন ভাবের প্রকাশে ভাষা কখনই বাধাস্বরূপ নয় বরং সুকুমার বৃত্তি প্রকাশের সহজবোধ্য প্রকৃষ্ট

মাধ্যম হিসেবে ভাষার কার্যকারিতা অসাধারণ। তাঁর কবিতায় তারা, শিশিরবিন্দু, প্রজাপতি, ভ্রমর, ফুল, অস্তগোধূলি, অতীত স্মৃতি, শিশু সব কিছুই প্রেমের বিষয় হয়ে উঠেছে। তবে আগেই বলেছি কেশবসুতের প্রেমে দুঃখভাবনা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। ভ্রমর যদি তাঁর কাছে আনন্দের প্রতীক হয়ে থাকে, পেঁচা তাঁর কাছে দুঃখের প্রতীক রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর 'পেঁচা' কবিতা নিঃসন্দেহে ব্যথা বেদনারই অন্য নাম, এই পেঁচা তাঁর নিত্য সহচর যার কাছে মাথা কুটলেও সে তাকে ছাড়বে না। এই কবিতায় এডগার অ্যালান পোর একটি কবিতার ছায়া পড়লেও স্বকীয় ভাবনায় কবিতাটি অনন্য, ভাস্বর।

লোকমান্য তিলক কেশবসুতের পুনা প্রবাসকালীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিলক-প্রদত্ত ক্লাসের পড়া কেশবসুতের ভাল লাগত না। কিন্তু কেশরী পত্রিকায় তিলকের সিংহনাদ তাঁর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জ্যোতি বা ফুলের সমাজদ্রোহিতা, চিপলুণকরের বক্তব্য (ইংরাজী শিক্ষা বাঘের দুধ খাওয়ার নামান্তর), আগরকর কর্তৃক সমাজ সংস্কারের উদ্দেশে নূতন যুগকে আহ্বান ইত্যাদি ঘটনাও কেশবসুতের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। তাঁর জীবনে বা সাহিত্যে রাজনীতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না সত্য, কিন্তু প্রচলিত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরতে কুণ্ঠিত হন নি। একজন শিক্ষককের ছাত্রকে অযথা বেত্রাঘাত করতে দেখে তিনি কবিতার মাধ্যমে তাকে শিক্ষকতা ছেড়ে কসাইয়ের কাজ নিতে বলেছিলেন। 'নবা সিপাই' (নূতন সৈনিক), 'তুতারী' (তূর্য), স্ফূর্তি ; 'অস্ত্যজ্যাচ্যামুলাচা পহিলা প্রশ্ন' (অচ্ছুৎ বালকের প্রথম প্রশ্ন), 'মূর্তিভঞ্জন' ইত্যাদি কবিতায় পুরাতন ও গতানুগতিকের বিরুদ্ধে এমন একটি বিদ্রোহ আছে যা মরাঠী সাহিত্যে অভূতপূর্ব। 'মজুরাওয়র উপাসমরীচী পালি' (শ্রমিকের উপবাস) এবং 'মূর্তিভঞ্জন' কবিতায় যে সাম্যবাদী সুর ধ্বনিত হয়েছে তেমনটি সেযুগে আর কোনো ভারতীয় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এদিক দিয়ে বিচার করলে কেশবসুতই ভারতের প্রথম সাম্যবাদী কবি বলে স্বীকৃতি পাবেন। এই সব কবিতা থেকে প্রমাণ হয় কেশবসুত ছিলেন মানবিকতার অতন্দ্র প্রহরী। যা কিছু জীর্ণ, দীর্ণ, যা কিছু কুসংস্কারপূর্ণ, সবেরই বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। পরাধীনতার অনুভূতি তাঁরও কম ছিল না। স্বাধীনতা লাভের ব্যাকুলতা নিচের পংক্তিগুলিতে অভ্রান্তভাবে ধরা পড়েছে : "দাসত্বের কালো রাত কবে হবে ভোর ? / ভারত হবে না দীপ্ত কিরণে সূর্যের ? / এই অন্ধ কারাগার কোথা শেষ তার ? / ভারত পাবে না ফিরে নিজ অধিকার ?" 'তূর্য' কবিতায় স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবার পুনর্বিবাহ ও মস্তকমুণ্ডন, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রগতিবাদী চিন্তা বিধৃত হয়েছে। 'অচ্ছুৎ বালকের প্রথম প্রশ্নে' অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কবির জেহাদ অন্তর ছুঁতে বাধ্য। পুরোপুরি দেশপ্রেমমূলক কবিতা কেশবসুত লেখেন নি বললেই চলে। কবি কোনো রাজনৈতিক দলে ভেড়েন নি। কেউ কেউ বলেন কবি নাকি ইচ্ছা করেই এমনটি করেন নি। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। এমন আচরণের মূলে আছে তাঁর অন্তর্নিহিত বিষণ্ণতা যা কোনো কিছুর প্রতি কমিটেড হবার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে রাজনৈতিক দলের প্রতি কমিটেড না হলেও আদর্শের প্রতি অবশ্যই তিনি কমিটেড ছিলেন। তাঁর মনে কোনো অন্ধ গোঁড়ামি ছিল না বলেই কেশবসুত অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে ভয় পান নি। কেশবসুত পরিবর্তনের কবি ছিলেন, না বিবর্তনের, তা নিয়ে

মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ তাঁকে অনাগত কালের ভগীরথ বলেছেন, কেউ বলেছেন তিনি যুগের ধর্মে সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র ; তিনি যুগপ্রবর্তক নন, বড়জোর সমাজসংস্কারক ছিলেন। কেশবসুত সাম্য, স্বাধীনতা, বিশ্বসৌভ্রাত্রের জয়গান গাইলেও তাঁর শ্রমিক কমিউনিস্ট নয়—এমত অনেকের ধারণা। 'তূর্য' লেখার সময় মার্কসের বাণী সম্ভবতঃ এদেশে পৌছায় নি, পৌছালেও কেশবসুতের পক্ষে তা পড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। তা সম্ভব হলে যে কবি বলেন, 'বাবুরা ওড়ান টাকার ফানুস / তিলে তিলে মরে উপোসী মানুষ', তাঁরই ভুখা শ্রমিক কি করে বলতে পারে 'ধনিকের 'পরে নাই কোনো ঈর্ষ্যা দ্বেষ' ? কেশবসুতের সাম্য ধারণা ও সমাজ সংস্কারের চিন্তা মুখ্যতঃ চিন্তানায়ক আগরকরের প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি। সে যাই হোক, পুরোপুরি রাজনীতিক কবি না হলেও কবি ছিলেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত, প্রবঞ্চিতের স্বপক্ষে। তাই অবিচার, ব্যভিচার, অত্যাচার, জন্মজাত কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই উচ্চকিত : 'বেদোক্ত যুগে পান করিতেন মুনিরা যে সোমরস / তারি কিছু দাও : বিবেকেরে মারো লাথি ঝাঁটা পাঁচ দশ ! / আমাদের কাজে বাধা দিতে চায় স্বর্গবাসীরা যদি ! মহারণ হবে, পিছু হটিব না, বহুক রক্তনদী। / ...ক্রান্তি পতাকা দিকে দিকে এঁটে আনিব মহাপ্রলয় / ঝঞ্ঝার স্রোতে অন্যায় যত কুটো হয়ে ভেসে যায়।' বিশ্বমানবতার পূজারী কেশবসুত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম ভালবাসা দিয়ে শুধুমাত্র আপনজনের মনই জয় করা যায় না, প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বসত্তার অনুভব নিজের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। 'নূতন সৈনিক' কবিতাটি বিশ্বভ্রাতৃত্বের নব অভিজ্ঞান রূপে বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে : 'এই পৃথিবীর সবখানে আছে আমারই হাজার ভাই / আমারই হাজার ঘরে ছেয়ে আছে সমস্ত দুনিয়াই। / নিজেকে ছাড়া যে আর কারো কাছে নোয়াই না এই শির / আপনার মাঝে অন্যেরে দেখে পূজা করি পৃথিবীর। / জানি না কে ভালো, কাহারা মন্দ / উচ্চ নীচের রাখি না দ্বন্দ্ব / নিকট দূরের বাধা ও বন্ধ ; / সকলেই বড়ো, ভালো, কাছাকাছি, বাঁধি মিলনের নীড় / শক্তি না ধরে আমারে হারাতে পৃথিবীর কোনো বীর। / সূর্য-আলোকে তিলক আঁকিয়া অনাগত শক্তির / নব উৎসাহে আগামী দিনের প্রেরিত আমি যে বীর।' মনে রাখতে হবে কবি এই ডাক দিয়েছিলেন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। সে যুগে এমন বিশ্বভ্রাতৃত্বের আহ্বান চমকপ্রদ ও অভিনব ছিল না কি ? কেশবসুতের এই নব মানবতাবাদের জয়গান মিশে আছে বুদ্ধের করুণা ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার স্ব-উদ্ভাবিত চিন্তাধারা। ধর্মের ভেক নিয়ে সমাজপতিরা মূর্তি পূজার আড়ালে যে অনাচার, শোষণ, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচারের তাণ্ডব চারদিকে জাগিয়ে রেখেছে সেই সব পুঞ্জীভূত পাপের বিরুদ্ধে 'মূর্তি ভঞ্জন' এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ধর্মের বিরুদ্ধে এমন নির্ভীক তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ সেযুগে অন্য লেখকের পক্ষে কল্পনাতীত। 'ভাঙ্ ভাঙ্ তোরা দেবের কপাট / গুপ্তধন কর্ রে লোপাট ! / মূর্তিরই বেশে ডাইনি যে বসে / খায় যে কাঁচাই দিব্যি কষে, / ঐ শয়তানির হব না শিকার, / ভাঙ্ ভাঙ্, কর্ সব চুরমার।' কবিতার শেষে কবি প্রাচীন মূর্তি ভেঙে নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অর্থাৎ প্রাচীনকে বিদায় করে নূতনের অভিষেক চেয়েছেন।

কেশবসুতের যে ১৩২টি কবিতার সন্ধান মেলে তার মধ্যে ২৫টি হল অনুবাদ। ৪টি সংস্কৃত থেকে (রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়ম ইত্যাদির অংশবিশেষ সহ), ২১টি ইংরাজী থেকে (এর মধ্যে

গোয়েটে, গোতিয়ে এবং উগোর তিনটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদের মরাঠী অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত)। অনূদিত কবিদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী ব্রাউনিং, টমাস হুড, এডগার এ্যালান পো, এমার্সন, স্কট, লাইলি, লী হান্ট ইত্যাদি। এই অনুবাদের মধ্যে আছে শেকসপীয়রের তিনটি এবং ড্রামণ্ডের দুটি সনেট। এ ছাড়া লংফেলো, পো, কোলরিজের তিনটি কবিতার ছায়া অবলম্বনে কবিতা রচনা করেন—এতে মূলের ভাব ও গঠন অবিকৃত থাকলেও ছন্দ ও পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই অনুবাদের সবগুলিই উচ্চস্তরের নয়। তবু না মেনে উপায় নেই ভাবের দিক দিয়ে না হলেও কাব্যরূপের গঠনগত দিক দিয়ে নানা বৈচিত্র্য এনেছিলেন কেশবসুত। তিনি মরাঠীতে যে সনেট-রূপবন্ধ প্রবর্তন করেছিলেন তা ছিল অভিনব। ফলতঃ তার প্রভাবও হয়েছিল অবিসম্বাদী। তিনি শেকসপীয়র, মিলটন ইত্যাদির মূলের অন্ত্যমিলের কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে মরাঠীতে সনেটের রূপকে ব্যবহার করেছেন। বিদেশী রূপকল্পের মত বিদেশী ছন্দও অনায়াসে গ্রহণ করেছেন। তাঁর সনেটের ছন্দোবদ্ধ রূপ কালক্রমে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। উৎপ্রেক্ষাবহুল ইংরাজী গীতিকবিতা তিনিই মরাঠীতে আমদানি করেন। দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা লেখার চল তাঁরই দেখাদেখি চালু হয়েছে মরাঠীতে। গজল-অনুসারী দুই পংক্তির তৎকৃত রচনা পরবর্তীকালে খুবই সমাদর লাভ করেছিল। তিনি বিভিন্ন ছন্দের একক প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পংক্তি বিভাগ করে হ্রস্ব দীর্ঘ ও এই দুয়ের মধ্যবর্তী পংক্তি ব্যবহারেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রাচীন মরাঠী কাব্যে কেবল পয়ার ও চৌপদী চালু ছিল। কেশবসুত পাঁচ, ছয়, সাত পংক্তির ছন্দ প্রবর্তন করেন। হিন্দী কাব্যের দোহা-ছন্দ মধ্যযুগীয় কবি মোরোপন্তের পর তিনিই পুনঃপ্রবর্তন করেন। তিন মাত্রার ছন্দের বন্ধন স্বীকার না করে স্বরবর্ণের লঘুগুরু মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কোথাও কোথাও ভাবপ্রকাশের উপযোগী করার জন্য শেষ পংক্তিকে অন্য পংক্তির চেয়ে দীর্ঘায়িত করলেন। প্রচলিত চার পংক্তির পয়ার তিনি খুবই কম লিখতেন। তাঁর পূর্বে কোনো কোনো ছন্দোরূপকে বিশেষ রসের দ্যোতক বা ভাবের বাহন বলে মনে করা হত। কেশবসুত সেই সংস্কার ভেঙে ধর্মীয় বা ভক্তিকাব্যের ছন্দেই সমাজবিদ্রোহের কবিতা লিখলেন। কবিতার মিলের ব্যাপারেও তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। পর পর তিন পংক্তিতে মিল বসিয়ে চতুর্থ পংক্তিকে টেনে পঞ্চম পংক্তির সংগে সাদৃশ্য রেখে অন্য মিল বসিয়েছেন ('নবা শিপাই', 'স্ফূর্তি' ইত্যাদি কবিতা দ্রষ্টব্য)। মিলের ব্যাপারেও তিনি স্বরান্ত ধ্বনির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। কখনো কখনো প্রথম পংক্তির মিল সাদৃশ্য পেয়েছে পঞ্চম পংক্তিতে, মাঝের পর পর তিন পংক্তির মিল থেকে তা আলাদা ('তুতারী')। ফারসি গজল সুলভ প্রথম পংক্তির সংগে তৃতীয়, দ্বিতীয়র সংঙ্গে চতুর্থ পংক্তির মিল তাঁর প্রিয় ছিল। তাঁকে একই স্তবকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ছত্র লিখতে দেখা গেছে। শার্দূল বিক্রীড়িত ('আম্হী কোণ'), স্রগ্ধরা ('শব্দানোঁ, মাগুতে যা'), ভুজংগপ্রয়াত ('অন্ত্যজাচা মুলাচা পহিলা প্রশ্ন'), দিণ্ডী ('এক থেডেঁ'), ইন্দ্রবংশা ('মজুরাওয়র উপাসমারীচী পালি'), মণিবন্ধ ('ভৃংগ'), অঞ্জনীগীত ('ফুল পাংথরু'), বসন্ত তিলকা ('ফুলপাংথরু'র শেষাংশ), ইন্দ্রবজ্রা ('পুষ্পাপ্রতের শেষাংশ) ইত্যাদি প্রাচীন ছন্দ নৈপুণ্যের সংগেই তিনি প্রয়োগ করেছেন। এই সব প্রাচীন ছন্দে অন্ত্যমিল প্রায় থাকে না, কেশবসুত কিন্তু অন্ত্যমিলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর অন্ত্যমিল কোথাও কোথাও হাস্যকর

হয়েছে। তিনি প্রবহমান অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করেন নি সত্য, কিন্তু অন্ত্যমিল বর্জিত কবিতাও তিনি লিখেছেন (মূর্তি ভঞ্জন)। শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি যাতে হ্রাস না পায় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

কেশবসুতের কবিতায় অসীম ও অতীন্দ্রিয় রহস্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তাঁর কবিতায় দেবদেবীর উল্লেখ তেমন দেখা যায় না সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে অধ্যাত্মচিন্তা তাঁর কবিতায় নির্ভুলভাবে ধরা পড়েছে। কাব্যে সুন্দরের স্থান কি ও কোথায়, এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট। প্রেমের কথা বলতে গিয়ে মৃত্যুর অবতারণা করে, মৈত্রী বা করুণার কথা প্রসংগে হিংসা বা নিষ্ঠুরতার কথা বলে পারস্পরিক বৈপরীত্য প্রমাণে সচেষ্ট হতেন না। শিশুসুলভ সরলতা তাঁর কাব্যের বিরাট আকর্ষণ। কেশবসুতই প্রথম মরাঠীতে ব্যক্তিগত কবিতা লেখেন, তাঁর পথ ধরেই পরবর্তী কবিরা কাব্যকে আত্মপ্রকাশের সত্যকার বাহন বলে ভাবতে শিখেছেন। আধুনিক মরাঠী কাব্যের ভাব ও রূপ—উভয়ক্ষেত্রেই তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথিকৃৎ। মরাঠী কাব্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার সীমায় প্রকৃতিকে স্থান দিয়েছেন, কখনো প্রকৃতিকে করেছেন আধ্যাত্মিকতার বাহন। নিছক ঋতুবর্ণনা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। রোমান্টিক কবিসুলভ কল্পনার বিস্তার সর্বপ্রথম তাঁর মধ্যেই দেখা গেছল। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতার সন্ধান তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের মূলকথা—বনবাণীর মধ্যে তিনি অনন্ত স্বরূপের আহ্বান শুনেছেন, যদিও রবীন্দ্রনাথের মতো বনবাণীর মধ্যে শেষমেষ স্থায়ী আশার আলো খুঁজে পান নি। তিনি না ছিলেন পুরো নাস্তিক, না পুরো দুঃখবিলাসী। আবার কোনো বিশ্বাসে স্থির নিশ্চিতিও ছিল না। 'ঈশ্বর প্রকৃতির কবি, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রকাশ' এমন কথাও মন খুলে বলতে পারেন নি। মনের মধ্যে সর্বদাই একটা বিদ্রোহ ছিল। এই বিদ্রোহ তাঁকে সমাজবাদী কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এ যেমন সত্য, তেমন মানসিক শান্তির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে এও তেমন সত্য। তা না হলে যিনি বনবাণীর মধ্যে অনন্ত স্বরূপের সন্ধান পেয়েছেন তিনি সেই স্বরূপের, সেই পরম রতনের চাক্ষুষ দর্শন লাভের জন্য খুঁজে বনে বনে ঘুরে সেখানে তাঁকে না পেয়ে নিরাশ হবেন কেন? নিজের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে আস্থা থাকলে তাঁর নিত্যসঙ্গী বিষণ্ণতা অবশ্যই ঘুচে যেত এবং ব্যক্তিজীবন আরও সুখের হতে পারত। সে যাই হোক, সংক্ষেপে এটুকু বলা চলে যে, উনিশ শতকে ভারতে যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল তার কয়েকটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য—যথা, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতাকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা, বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার বাসনা, সামাজিক অবিচার দূর করে সমতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা, বিশ্বভ্রাতৃত্বের জয়গান—কেশবসুতের রচনায় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মরাঠী কবিতায় এইসব কার্য সাধনের জন্য কেশবসুত কাব্যকে শিক্ষা বা নীতির মাধ্যমরূপে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। নিজস্ব বিষণ্ণতা তাঁকে না পেয়ে বসলে কবির কাছে গভীরতর ভাবের সমুন্নতি ও বিশালতা আশা করা যেত। তাই বলে যা পেয়েছি তাও কিছু কম নয় যুগ ও পরিবেশের তুলনায়। কেশবসুতের প্রেরণাপূর্ণ কবিতাপাঠে অভিভূত হয়ে তাঁর মৃত্যুর পর কবি গোবিন্দাগ্রজ বলেছিলেন: 'কেশবসুত কসলে মলে? কেশবসুত গাতচি বসলে' (কে বলে কেশবসুত মরে গেছেন? আরে কেশবসুত তো গেয়েই চলেছেন)।

আলোচনা

কুমারসম্ভব—কাব্য ও কবি

কালিদাসের কাল কেটে গেছে অনেকদিন কিন্তু কালিদাসের কাব্য আজও বহুযুগের ওপার হতে মাঝে মাঝে রসঘন সন্দেশ নিয়ে উপস্থিত হয় বিদগ্ধ সাহিত্য মধুব্রতের কাব্যমঞ্জুরী সঞ্চয়নের মাধ্যমে। কালিদাসীয় কাব্যত্রয়ীর অন্যতম হচ্ছে মিলনোৎসবের সুরে গাঁথা কুমারসম্ভবের কাব্য। প্রতীচ্যয় কাব্যরসিক ষ্টেনজলার এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৮৩৮ সালে। মনীষী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ জ্যাকোবি কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গোত্তর কাব্যাংশের মৌলিকতা নিয়ে প্রথম বিতর্কের সূত্রপাত করেন ১৮৮১ সালে। (১) সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ কুমারসম্ভবের বঙ্গীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮৭২ সালে। মল্লিনাথ চরিত্র বর্ধন ও সীতারামকৃত টীকা সহ সপ্তদশ সর্গাত্মক সম্পূর্ণ কুমারসম্ভবের অপর একটি সংস্করণ ১৮৯৮ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত বিট্টলদেব শাস্ত্রী অষ্টম থেকে সপ্তদশসর্গ পর্যন্ত কুমারসম্ভবের বিতর্কিত অংশ প্রকাশ করেন অধুনালুপ্ত পণ্ডিত পত্রিকায় ১৮৮৬ সালে। এর পরে ১৯১৪ সালে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী অরুণগিরি ও নারায়ণের টীকা সমেত অষ্টমসর্গ পর্যন্ত কুমারসম্ভব কাব্য প্রকাশ করেন। কে পি পরব ও পানসীকর সম্পাদিত ১৯০৮ সালের নির্ণয় সাগর সংস্করণও অষ্টমসর্গে সম্পূর্ণ। মহামহোপাধ্যায় গণপতির পর বাংলাদেশে কুমারসম্ভবের অনবদ্য তত্ত্ববিশ্লেষণ করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (২) তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। (৩) বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্রতিভার নববারি সিঞ্চনে এই মহাকাব্যকে অভিষিক্ত করেন কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ। তারপর আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কুমারসম্ভবের প্রায় ২৫/৩০টি সংস্করণ ও রসাত্মক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। (৪) তবু সব কথা বলা হয় নি। তাই নতুন দৃষ্টিতে আর নতুন পটভূমিকায় সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক রসগ্রাহী আলোচনার মাধ্যমে বহু পরিচিত কাব্যকেই নতুন করে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন কবি অধ্যাপক মনোমোহন দত্ত তার 'কুমারসম্ভব কাব্য ও কবি' শীর্ষক গ্রন্থে। (৫) ফুলের মধ্যে যেমন জাতিফুল নগরের মধ্যে যেমন কাঞ্চী, নারীরত্নের মধ্যে যেমন রম্ভা, পুরুষের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, কবির মধ্যে তেমন কালিদাস। এই মহাকবি কালিদাসেরই রচনা কুমারসম্ভব দেবতাত্মা হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পটভূমিকায়। এ কাব্যের রসানুভূতির জন্য কবির রচনাকাল, কাব্যের স্বরূপ ও সমসাময়িক পরিবেশ এই তিনটিরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কবির কাল অনেকদিন কেটে গেলেও সন তারিখের আঁচড়ে তাকে চিহ্নিত করা হয়ত সম্ভব। আইহোল বা মান্দাসোর শিলালেখ এখন পুরানো কথা। চতুর্ভাণীতে পাওয়া গেছে কালিদাসের ভাষা ও ভাবের অপূর্ব অনুকরণ। অনুকরণ থেকে আত্মীকরণ প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলে দেয় যে কালিদাস খৃষ্টিয় চতুর্থ শতকের আগের লোক। শকুন্তলা নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম যাজ্ঞবল্ক্যেরও বহু পূর্ববর্তী। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে পাওয়া ভিটা (৬) মেডালিঅনে

শকুন্তলা নাটকের প্রথম চারটি অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাম্বোজ, পারসীক, হুণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির উল্লেখ এবং বক্ষু বা অক্ষু নদীর বর্ণনা খৃষ্টজন্ম সমসাময়িক কালের দিকেই ইঙ্গিত করে। কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ববর্তী। জ্যোতির্বিদ্যাভরণ এখনও বিদগ্ধ মহলে পঙ্‌ক্তিভাজন হয় নি। কিন্তু কালিদাসের প্রখর জ্যোতিষজ্ঞান থেকে মনে হয় যে জ্যোতির্বিদ্যাভরণের খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের রচনাকালটি সম্ভবতঃ নির্ভুল। কালবিচারে কালিদাসকে খৃষ্টজন্মের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ববর্তীরূপে চিহ্নিত করার দিকেই আজকের গবেষকদের প্রবণতা।

এর পরই আসে কাব্যের স্বরূপবিচার। কুমারসম্ভবের দৈর্ঘ্য কতটুকু? অধ্যাপক জ্যাকোবি ওয়েবার, ভিন্টারনিৎস, মম গণপতি শাস্ত্রী, হরিচাঁদ, মম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. কীথ, ডঃ সুশীল দে ও ডঃ রাঘবন প্রমুখ বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী কুমারসম্ভবের প্রথম থেকে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত অংশকেই প্রামাণিক মনে করেন। এঁদের কয়েকজন আবার অবশিষ্ট নয়টি সর্গের কাব্যসৌন্দর্য ও সাহিত্যিক মূল্য অঙ্গীকার করেও এই অংশকে কালিদাসোত্তর জনকৃতি বলেই মনে করেন। অন্যদিকে পণ্ডিত বিট্টল শাস্ত্রী, শঙ্করপ্রসাদ পণ্ডিত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, অধ্যাপক কারমারকার, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শ্রীসূর্যকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বন্মণ্ডলী মনে করেন যে সম্পূর্ণ সপ্তদশ সর্গই কালিদাসের রচনা। (৭) প্রথম পক্ষের অভিমতের সারমর্ম হচ্ছে যে এই অংশের কোন উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। কোন প্রাচীন আলঙ্কারিক এই অংশ থেকে শ্লোক অথবা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করেন নি। উজ্জ্বল দত্ত তাঁর উনাদিসূত্রবৃত্তিতে যে শ্লোকাংশ কুমারসম্ভব থেকে উদ্ধৃত করেছেন বলে মনে করা হয় তা মূলতঃ জানকীহরণের শ্লোকাংশ। কোন খ্যাতনামা টীকাকার এই অংশের টীকা রচনা করেন নি এবং শিল্পগত মূল্যায়নেও এই অংশ প্রথমাংশ থেকে নিকৃষ্ট। কিছু ব্যাকরণগত ত্রুটি ও ছন্দ ব্যবহারের দোষও এই অংশে দেখা যায়।

দ্বিতীয় পক্ষের অভিমতে কুমারসম্ভব নামটিই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে যে শুধু কুমারের জন্মই প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে তা নয়, যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার জন্ম তারও ইঙ্গিত এতে রয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে তারকাসুরের বধ। সপ্তম বা অষ্টম সর্গ পর্যন্তই কালিদাসের অভিপ্রেত হলে কাব্যের নাম "শিব-পরিণয়" জাতীয় কিছু হত। চতুর্থ সর্গে দেখা যায় দেবতারা তারকাসুরের নিধনই প্রার্থনা করেছেন। এজন্য কুমারসম্ভব এই নামকরণটিই বস্তুনির্দেশক। প্রাচীন আলঙ্কারিক সম্প্রদায় মহাকাব্যের যে নূতনতম সর্গসংখ্যা নির্দেশ করেছেন তা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে এই মহাকাব্য অষ্টম সর্গের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলে তার মহাকাব্য সংজ্ঞা হত না। কুমারসম্ভবের উৎস শিবপুরাণ। শিবপুরাণেও শিবের পরিণয় ও কার্তিকের জন্ম দেখা যায়। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের মধ্যে ভাষাগত অপূর্ব মিল দেখা যায়। আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে অনৌচিত্য মূল হলেও কুমারসম্ভমের অষ্টম সর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং অনৌচিত্যমূলক অংশ যদি প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয় তাহলে অশ্লীলতাদোষবর্জিত ও সাধারণ সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ নবম থেকে সপ্তদশ সর্গাবধি অংশের প্রামাণ্য স্বীকারে বাধা কোথায়? এই বিদ্বন্মণ্ডলীর মতে এই অংশে যেমন উল্লেখযোগ্য কোন অলঙ্কারশাস্ত্রগত বৈশিষ্ট্য নেই তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ত্রুটিও নেই। সাধারণ ব্যাকরণদোষ ও ছন্দোভঙ্গ কালিদাসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ রচনাতেও পাওয়া যায়। কোনও কোনও প্রসিদ্ধ মহাকবির

সমগ্র রচনার মধ্যে আদ্যোপান্ত একই প্রকারের রচনাশৈলী দেখা যায় না। লেখার মধ্যেও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ থাকে। কুমারসম্ভব কাব্যের সূচনা থেকে সপ্তদশ সর্গে সমাপ্তি পর্যন্ত মূল বিষয়ের সুস্পষ্ট ও ক্রমাভিব্যজ্যমান সঙ্গতি দেখা যায়। এগুলি নিঃসন্দেহে তথাকথিত প্রক্ষিপ্ত অংশের মৌলিকতার নিদর্শন। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে একটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন যা নিঃসন্দেহে বিতর্কাতীত। ভুবনেশ্বর সংগ্রহশালার অন্তর্গত একটি শিলামূর্তি তাঁর মতে কুমারসম্ভবের নবমসর্গে মহাদেবের রতিভঙ্গের চিত্র (শ্লোক ১৪)। অপর একটিতে নন্দী ও ভৃঙ্গীর মূর্তিসহ আলেখ্য নবম সর্গের ৪৭-৫০ সংখ্যক শ্লোকার্থের পরিপূরক। অধ্যাপক ভট্টাচার্য প্রসঙ্গতঃ কাঙড়া উপত্যকার কয়েকটি সুপ্রাচীন ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যেগুলির মধ্যে কৈলাসে মহাদেবের রতিক্রিয়া ও পারাবত-রূপী অগ্নিদেবের উপস্থিতি বিশদরূপেই দেখান হয়েছে। এছাড়াও শত পথ ব্রাহ্মণে রুদ্রশিবের নবম ভেদ অগ্নির সঙ্গে কুমার কার্তিককে অভিন্ন করে দেখান হয়েছে। ডঃ সূর্যকান্ত শাস্ত্রীর মতে হরপার্বতীয় মিলনোৎসব কুমারের প্রচণ্ড তেজের প্রতি উল্লেখ শতব্রাহ্মণের ঐতিহ্য ও তারকবধেরই প্রচ্ছন্ন দ্যোতক।

Alexander page ইলিয়াড ও ওডিসীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন "when you read Homer, you have to remove yourself to the remote antiquity of the heathen world…" কালিদাসের কাব্যবিচারের প্রসঙ্গেও আমাদের চলে যেতে হয় সেই কালিদাসের কালে। সেকাল ষষ্ঠ শতাব্দী নয়। তারও বহু পূর্ববর্তী। ভারতে রাজতন্ত্র তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ্যশক্তিনির্ভর ক্ষাত্রশক্তি তখন সমাজকে ন্যায় ও ধর্মের অনুশাসনে আবদ্ধ করে রেখেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রবাহ তখন অপেক্ষাকৃত স্তিমিত। গান্ধার হতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তসীমায় হূণ তরঙ্গদল চঞ্চুপাত করে প্রবল শক্তিধর রাজশক্তির তাড়নায় পলায়ন করেছে। সেকালের ভাস্কর্য ও প্রস্তরচিত্র দেখিয়ে দিচ্ছে যে (১০) গ্রীষ্মপ্রধান প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা উদ্ভিন্ন যৌবনা আর্যসুন্দরী বিরল মনোহর বেশে ঊর্দ্ধাঙ্গ শোভিত করে নিঃশঙ্কা হরিণীর মতন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। মধুমাসে মদন মহোৎসবে তরুণ তরুণীর লীলা-চঞ্চল রূপ বলিষ্ঠ সমাজ-জীবনের চঞ্চল প্রবাহকে দিবিদিকে বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে। আর্যহিন্দু নৃপতিরা তখন বলিষ্ঠ হাতে অস্ত্র ধারণ করতেন, সৌন্দর্য সচেতন দৃষ্টিতে নারীর রূপের পূজা করতেন। এই রূপোপাদনারই পরিচয় স্বাধীন আর্যহিন্দুর সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। সেকালের সমাজের এই বলিষ্ঠ রূপটিকে তুলে ধরেছেন অনবদ্য ভাষায় কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ তাঁর এক রহস্যোপন্যাসে (১১) —সেই দীর্ঘদেহী পুরুষ বললেন—তুমি ভারতীয়। তোমার পূর্বপুরুষরা বহু শতাব্দী আগে এদেশে এসেছিলেন। সভ্যতার আলোকবর্তিকা তাঁরাই প্রজ্বলিত করেছিলেন। তুমি দুর্বল। তোমাকে দেখে তাঁদের উত্তরাধিকারী বলে মনে হচ্ছে না…তাঁরা বলিষ্ঠ হাতে অস্ত্র ধারণ করতেন।"

যে দুর্বল আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ নারীর বাহ্য সৌন্দর্যকে স্থূল সম্ভোগের বিষয়ে পরিণত করে সেই পুরুষ তখনও আর্য সমাজে অপরিচিত। এইরকম এক সৌন্দর্যসচেতন বলিষ্ঠ প্রাণচঞ্চল পরিবেশে আবির্ভূত হয়েছেন কালিদাস। তাঁর কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে রতিবর্ণনা চৌষট্টি কলার অন্যতম কামকলার তাত্ত্বিক প্রয়োগ। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে কামনার ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক

এই দুইটি দিক বলিষ্ঠ সমাজজীবনে কিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই পরিবেশে যে সামাজিক নীতিবোধ প্রচলিত ছিল তাতে বহুভর্তৃকা রমণী সম্রাজ্ঞীপদ লাভ করতেন, বিদুষী কলাকুশলা বারাঙ্গনা কুলবধূর মর্যাদা লাভ করতেন এবং নারীমাত্রেই সেখানে মহার্হা গৃহদীপ্তি-রূপিনীরূপে শোভা পেতেন। এই যুগের রুচি ও নীতিবোধ অনেকের রুচি ও নীতিবোধ থেকে অবশ্যই ভিন্ন। সামাজিক নীতি ও রুচির যুগে যুগে পরিবর্তন হয়। এক যুগের শিক্ষাদীক্ষা ও নীতিবোধের মানদণ্ডে অন্যযুগের সাহিত্যে বা সমাজের বিচার সার্থক হয় না। প্রেমের দেহী ও বিদেহী এই দুয়ের অথণ্ড রূপায়ণে কালিদাসের প্রণয়চেতনার ও দাম্পত্যাধর্মের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এজন্য অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন যে সমগ্র কুমারসম্ভব একটি সুরে বাঁধা তাকে খণ্ডিত করে দেখলে এই সমগ্রতার উপলব্ধি হয় না।

কুমারসম্ভব তথা কালিদাসের সমস্ত কাব্যের বিচারের জন্য এই পটভূমিকে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এই পটভূমি বিস্মৃত হওয়ার জন্যই ডঃ রাঘবন্ প্রমুখ অনেক বিদগ্ধ মনীষী কুমারসম্ভবের সঠিক মূল্যায়নে অসমর্থ হয়েছেন। উনবিংশ শতকে ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার পুনরুজ্জীবনে প্রতীচীর গবেষকদের দান অপরিমেয়। কিন্তু ভিক্টোরীয় যুগের যে নীতিবোধ ও শুচিবাদ সমসাময়িক প্রাচী ও প্রতীচীর মনীষীদের প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণ তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এজন্যই স্যর উইলিয়াম জোন্স থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের বিচারেও এই প্রতীচ্য নীতিবোধ ও শুচিবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার ফলে স্বাধীন আর্যভারতের চেতনা ও সৌন্দর্যবোধের মূল সূত্র তাঁদের সমীক্ষাশাস্ত্রের গণ্ডীর বাইরে রয়ে গেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্য বিচারে। জ্যাকোবি থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কমবেশী একই ধারার অনুসরণ করেছেন।

কুমারসম্ভবের সর্বাধুনিক মূল্যায়নেও লেখক শ্রীমনোমোহন দত্ত একই ভিক্টোরীয় যুগের নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যসচেতন বলিষ্ঠ রূপটি তাঁর বিচার বিশ্লেষণের বাইরে রয়ে গেছে। কালিদাসের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাঁর পুনরুক্তি। (১২) কালিদাস তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ভাবের, ভাষার, পদের ও পদাংশের ক্রমান্বয়ে পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাঁর এই পুনরাবৃত্তি কোথাও পদদোষ বা রসদোষে পরিণত হয় নি। এজন্য তিনি যথার্থ মহাকবি। এই পুনরুক্তিও তিনি ঘটিয়েছেন তৎকালীন সামাজিকের রসাস্বাদের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে। কালিদাসের সৌন্দর্যচেতনায় গ্রীক প্রভাব ততখানি পরিস্ফুট নয় যতখানি পরিস্ফুট দেবশিল্পী প্রভাব। লামা তারানাথ (১৩) তাঁর বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সঙ্কলনে বহু প্রাচীন একটি ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন। এই ঐতিহ্য অনুসারে খৃষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বেই ভারতীয় শিল্প প্রধান দেবশিল্প ও নাগশিল্প এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর ভারতে প্রধানতঃ দেবশিল্পের ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছে এবং উত্তর পশ্চিম হতে দক্ষিণ ভারতে নাগশিল্পশৈলী অনুসৃত হয়ে এসেছে। কালিদাসের রূপচেতনা এই দেবশিল্পের ধ্যানধারণায় আলোকিত। কালিদাসের কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য বিচারে এই ঐতিহ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

অনন্যসাধারণ মনোহর পটভূমির মধ্যেও কালিদাসের কাব্যের সরস ও মৌলিক বিশ্লেষণে যে দক্ষতা

লেখক দেখিয়েছেন তা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি সুগভীর এবং রসবোধ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা অতি উচ্চাঙ্গের। বর্তমান পল্লবগ্রাহিতার যুগে তিনি যে অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সপ্তদশ সর্গান্বিত কুমারসম্ভব মহাকাব্য তিনি অধ্যয়ন করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। বিষয়বস্তুর বিন্যাসে লেখক মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বিন্যাসের ক্রম, প্রথমত দ্বিতীয় সর্গ-উদ্‌যোগ তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গ সংঘাত, পঞ্চমসর্গ সাধনা, ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ সম্প্রাপ্তি অষ্টম থেকে সপ্তদশ উত্তরকবি। বিতর্কিত অংশের প্রামাণিকতা নির্ণয়ে তিনি জ্যাকোবি প্রমুখ সুধীমণ্ডলীর মতই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই মতের অনুসরণ করেও উত্তরকবির কাব্যের যে রসগ্রাহী বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাতে লেখকের যথার্থ সমালোচকসুলভ নিরপেক্ষতাই প্রমাণিত হয়েছে।

কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ, শব্দ-সুষমা, ছন্দোবৈচিত্র—এ সবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদও লেখকের রসগ্রাহী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। নিঃসন্দেহে এই রচনা মধুবর্ষী; ইতিহাস আর তত্ত্ব সেখানে গৌণ, অনুভূতির গভীর প্রবাহে তা সঞ্জীবিত। একাধিক সুচারু উদাহরণ সহযোগে (পৃঃ ১০৯) লেখক দেখিয়েছেন যে কালিদাসের পরিমিতিবোধ ও শিল্পসুলভ সংযম কত উঁচুস্তরের ছিল। কুমারসম্ভবের কাব্যরূপের পেছনে যে নাটকীয় সম্ভাবনা আছে অসংখ্য ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে লেখক তা দেখিয়েছেন এবং বিশ্লেষণের মধ্যেও রচনার আকর্ষণীক্ষমতা যে ক্ষুন্ন হয় নি এটাই বিদগ্ধ লেখকের কৃতিত্ব।

অনেক সম্ভাবনা ও সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়েও এই গ্রন্থে কয়েকটি ত্রুটি রয়ে গেছে। ভারতীয় রসশাস্ত্র গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য-তত্ত্বগত উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু লেখকের রসতত্ত্ব ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সঙ্গে সম্ভবতঃ অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকায় 'মঙ্গলরস' নামে পৃথক রসের কল্পনা (পৃঃ ৩২) অথবা সকল রসের পর্যবসান বিস্ময়ে (পৃঃ ১৬১) 'অথবা' রসও রসাভাস বিষয়ক আলোচনার (পৃঃ ৪৪) এই প্রসঙ্গগুলি যথার্থ শাস্ত্র সম্মত হয় নি। সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ লেখকের রচনায় পটভূমি অর্থে 'প্রেক্ষণিকা' পদ (পৃঃ ৯৩), 'শরন্ময়ী'(পৃঃ ৯৮), উপলক্ষ, বিশ্বভূমীন এই শব্দগুলি একটু অস্বস্তিজনক। ভাষার গঙ্গাগদনদৎ প্রবাহ ও তদ্‌ভব তৎসম শব্দের গুরু গুরু ডম্বরে অনেক সময়ে মূল বক্তব্যের সূত্রটিও যেন ক্ষীণ হয়ে যায়। "উত্তর কবির শব্দাবলী রূঢ় দুরুচ্চার্য অপরিমার্জিত, মাধুর্যশূন্য" এই ধরণের অসাবধানতাপ্রসূত অগভীর মন্তব্য রসাস্বাদনে অহেতুক বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কিন্তু এহ বাহ্য। যা নেই তা নেই, যা আছে তাই আছে। যেসব অন্ধ হারিয়ে গেছে যে সঙ্গীতের ধ্বনি নীরব হয়ে গেছে, শিপ্রা নদী পারের অমর কবির অমর বীণাকে আবার জাগ্রত করে রসিক লেখক সেই হারানো যুগ আর হারানো সুরকে আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থিত করেছেন। মধুরসের কবির মধুময় কাব্য আবার জন্মলাভ করেছে নতুন মধুচক্রে—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

(১) ডঃ সুশীল দে প্রণীত History of classical Skt-Lit, পৃষ্ঠা ১২৬-১২৮ দ্রষ্টব্য। (২) নারায়ণ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, "কুমারসম্ভব সাত না সতেরো।" (৩) বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

(৪) New Catalogus Catalogorum vol, iv. pp 211-213. (৫) কুমারসম্ভব কাব্য ও কবি। লেখক শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রকাশক: দত্ত চৌধুরী এণ্ড সনস্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-২২, পৃষ্ঠা ২১৭। (৬) Arch. Survey of India, Report 1911-12, pt ii. plate xxiv. p 76. (৭) Kalidasa Citations pp 237-39. Ed. by N, R, Subbanna. (৮) ধ্বন্যালোকবৃত্তি: তৃতীয় উদ্যোত, কারিকা ১৩-১৫, পৃষ্ঠা ৩৩২, কাশী সংস্করণ। (৯) The authorship of the latter half of the Kumarasambhavam—J, A. S, B. vol xx. No. 2, এবং T. N. Ramachandram প্রণীত The identification of two interesting Sculptures from Orissa শীর্ষক প্রবন্ধ I. Oriental Reserch. Madras vol. xix. pt 1. pp 1-13. (১০) Journal of the Society of Oriental Art পত্রিকায় মতিচাঁদ ও আগরওয়ালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (১১) 'হৈরামাণিক জলে'—পৃঃ ৯৩। (১২) A concordance of Kalidasas pomes—T. K. R. Ayer দ্রষ্টব্য। (১৩) History of Buddhism in India—A, Schiefner কর্তৃক অনূদিত ও ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত।

ত্রিপুরার পুঁথি-পত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা (১ম খণ্ড)॥ সম্পাদনা : সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা অধিকার ত্রিপুরা। মূল্য ৪·০০।

রাজদরবারে সাহিত্যচর্চা এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন সাহিত্যিককে দরবার কর্তৃক উৎসাহ ও আনুকূল্য প্রদান মধ্যযুগের সামন্তপ্রভুদের অন্যতম বৈশিষ্টের মধ্যে ছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার পরমধ্য যুগ থেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের অবদানে বিশেষভাবে ঋদ্ধ হয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এই সমস্ত দরবারী সাহিত্যের ফসল সীমিত সংখ্যক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য পুঁথির পাতায় আত্মপ্রকাশ করত। এই পথে মঙ্গলসাহিত্য থেকে সুরু করে কত বিচিত্র সৃষ্টি যে কবে কখন বিস্মৃতির অতল তলে চলে গেছে কে তার হিসাব রাখে! ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ইংরেজ সরকার প্রাচ্যভাষা পঠনপাঠনের জন্য সরকারীভাবে পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ধুয়া তোলেন। তারপর থেকে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তা যথাযথ ব্যবহারের প্রসঙ্গ সাধারণের মধ্যে আসে।

মধ্যযুগ থেকে আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দেশীয় রাজন্যবর্গ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে আনুকূল্য দেখিয়ে আসছিলেন তাতে সহজে অনুমতি হয় এইসব পরিবারের গ্রন্থাগারে যথেষ্ট সংখ্যক মূল্যবান্ পুথিপত্র থাকা স্বাভাবিক। বর্তমান গ্রন্থটি ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী সংগ্রহশালা এবং সরকারী মহাবিদ্যালয়ে রক্ষিত পুঁথিপত্রের বর্ণনাত্মক তালিকা। এই তালিকায় সংগৃহীত পুঁথিগুলির ক্রমিক সংখ্যা ও বিষয়, পরিগ্রহণ সংখ্যা, পুঁথির নাম, ভাষা ও লিপি, গ্রন্থকার, অনুবাদক, আকার, পত্রসংখ্যা, পত্রের ছত্র সংখ্যা, ছত্রের বর্ণ সংখ্যা এবং অবস্থা ও প্রাচীনত্ব, সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ প্রভৃতি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের পুঁথির এই তালিকা সন্ধানীমাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন একটি নীরস অথচ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সম্পাদক সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। পরিশেষে একটি কথা : শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থে পদকল্পতরুর পুঁথি থেকে আলম কারিগরের দুটি চিত্রণ নমুনা উপহার দিয়েছেন। চিত্র দুটি লোকায়ত কলম ও দরবারী কলমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বলে শিল্পী আলম সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই। সম্পাদক মহাশয় যদি ভবিষ্যতে কোন সূত্রে আলম কারিগর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও তাঁর কীর্তি-নমুনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে শিল্পরসিকমাত্রের তিনি কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন।

পঞ্চধর ভট্টাচার্য

সমকালীন

সমকালীন প্রবন্ধের পত্রিকা

২৫ বছর মাসিক পত্রিকারূপে নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছর থেকে সমকালীন ত্রৈমাসিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ প্রতি বছর ৪টি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট বা রিপ্লাইকার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থে প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—সমকালীন 'প্রবন্ধের পত্রিকা'। লেখার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবেন না। ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-হরফে লিখে দেবেন।

'সমকালীন'-এর গ্রন্থ-পরিচয় প্রসঙ্গে, রসিক সমালোচকদের 'শিল্প', 'দর্শন', 'সমাজ-বিজ্ঞান' ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। তুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৪১৫৫